



ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ
୧୯୯୮

ଶ୍ରୀଜାନନ୍ଦା



Leela Majumdar - a loving Bengali household name

Most educated people in Calcutta are familiar with Leela Majumdar's writings for children. However, for some reason I was introduced to her much later in life, not through her literary works, but through her recipes. I have not seen such an remarkable book of recipes ever again. It feels like she is sitting right in front of me and teaching me how to cook. Coming from one of the two greatest families of Bengal, the Rays (her maiden name is Ray) it is not surprising that she herself is a jewel in their family crown. Her memoir for the young "Aar konokhane" (Somewhere else) and another for adults "Paakdandi" (Winding trails) have introduced me to a happy family, a bright young lady, and some people from her extended family who have brought up the cultural side of Bengal by a few notches. Besides teaching me how to cook and keep house, she has also shown through her own life how important one's family can be and that kids need nothing more than a happy home to grow up into positive, successful human beings.

সম্পাদনা (Editor) - সায়রী ঘোষ (Sayari Ghosh)
প্রচ্ছদ (Cover page) - সায়রী ঘোষ (Sayari Ghosh)
সহকারী সম্পাদক (Assistant Editor) - অর্ণব রায় (Arnab Roy)
অনুলিপি সম্পাদক (Copy Editor) - সুচেতা ঘোষ (Sucheta Ghosh)
প্রকাশক (Publisher) - A. Roy and Sons, Mill Creek, WA থেকে মুদ্রিত
Editorial Team - Lightning Roy, May Kitty Ghosh (MKG), Bebe Ghosh-Roy



nritprodip



সুচিপত্র

সম্পাদিকার কলম

বাঙালিয়ানা - সায়রী ঘোষ 1

From the Editor's desk

From the Warrior Goddess to a Bengali girl - Sayari Ghosh 2

প্রবন্ধ / Articles

The First Independence Day - Smita Chowdhry 4
Pseudo-Science: The New Religion - Tim Snyder 6
আমাদের সময়ে খেলা - শান্তনু ঘোষ 10
একটি পথের আত্মকথা - প্রণতি ঘোষ 12
The 7 dots - Arnab Roy 14

গল্প ও রচনা

অথ শ্রী মার্জার কথা - সুচোতা ঘোষ 16
সীমানা ছাড়িয়ে - রীতা ঘোষ 18
MCET: মুর্শিদাবাদ কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড ট্যাঙ্গানি - অভিযোক ব্যানার্জী 21
দুর্বল প্রেম - মঞ্জুরী রায় 24
কালচার শক - সৌমেন ঘোষ 26
ভূতের ডায়েরি - শ্রীমতি ভূত 28
জোরাবর পুজো বাড়ি - সায়রী ঘোষ 30
একটি মেয়ে ও আটা - শ্রীনিকা রায় 34

Photographs

Photo Journal: Australia and New Zealand - Subrata Ghosh 35
Project Planet Earth - Eric Holcomb 36

Profile

Q&A with a wave surfer - Thomas Quigley 37

International Food Court

Karubi - Dave Symons 41
Borsch - Andrei Tichenkov 42
কারিপাতার আলুর দম - রীতা ঘোষ 43
পের্যাজ ইলিশ - প্রণতি ঘোষ 44
Mary Baroody's \$10 Shortbread cookies - Eric Savage 45

3rd Language

Korean 101 - Suji Kim 46

রং - ভূলি / Drawing - শ্রীনিকা রায়, Colin Savage

Fillers

Jokes (compilation) - Dave Symons

হাসির কথা - সুচোতা ঘোষ

ধাঁধা (compilation) - শ্রীনিকা রায়



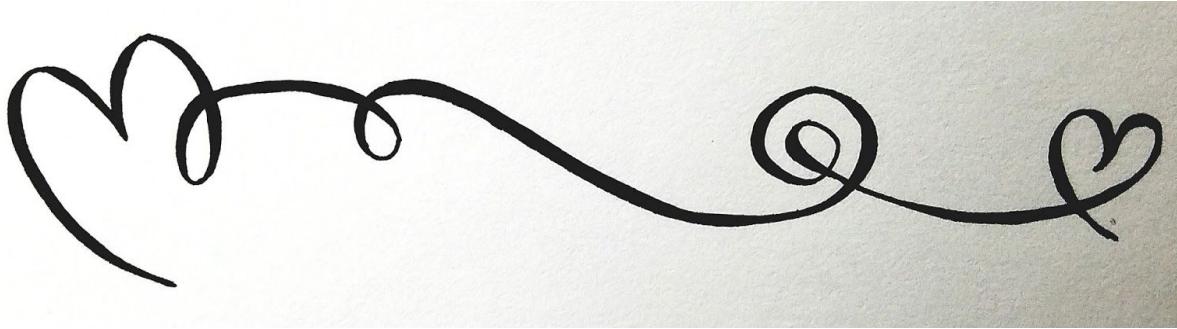
(ওপরে ডানদিকে) সালোয়ার কামিজের দোকান

(ওপরে বাঁদিকে) বাঙালির ভুরিভোজ

(নিচে বাঁদিকে) এই রাষ্ট্র কি গড়িয়াহাট নয়?

(নিচে ডানদিকে) “মুক্তধারা” বইয়ের দোকানে সহকারী
সম্পাদক মশাই





সম্পাদিকার কলমে -- বাঙালিয়ানা

সায়রী ঘোষ



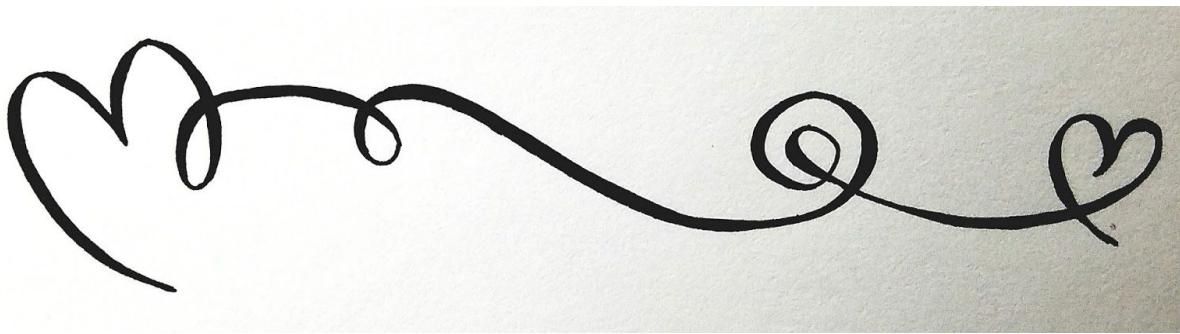
বাঙালীর গতি সর্বত্র। বলে নাকি তিক্কতের পাহাড়ে, আরব দেশের মরুভূমিতে, এমনকি চাঁদেও চেষ্টা করলে বাঙালী খুঁজে পেতে সেরকম কোনও অসুবিধে হয় না। এটা যে অনেকটা সত্যি সেটা আমি বুঝলাম কিছুদিন আগে নিউ ইয়র্কে বেড়াতে গিয়ে। নিউ ইয়র্ক শহরের এক ধারে হল কুইন্স বোরো, আর সেখানেই জ্যাকসন হাইটস। তাকে সহজ ভাষায় বলা যেতে পারে প্রবাসী গড়িয়াহাট। রাস্তার দুধারে লাইন দিয়ে সালোয়ার-কামিজের দোকান, খোলা বাজার, মাছের দোকান, মাছ-ভাতের দোকান, গয়নার দোকান, এমনকি হাত দেখানোর জ্যোতিষী পর্যন্ত পাওয়া যায় সেখানে। মাছ ভাতের কথা যে কি লিখব আমি জানিনা, কারণ ২০০৫ এ আমার পিসতুতো দাদার বিয়ের পরে একসঙ্গে বসে তিনরকমের মাছ আমি আর খাইনি। সেদিন খেলাম সরয়ে ইলিশ, মুলকপি দিয়ে কৈ, আর বাতাসী। ওঁ: একেবারে ভুলে গেছি, তার সঙ্গে শুঁটকি চচড়ি, মানে বাঙাল ভাষায় শুঁটকি ভর্তা। আমি তো যাকে বলে গোত্র পালটে বাঙাল, মানে ঘটি মেয়ে বিয়ে করেছে বাঙাল ছেলে কে। তাই শুঁটকি শনে আগে নাক সিঁটকোতাম। একবার বাড়িতে রান্না করে অত্যন্ত নাজেহাল হয়েছিলাম, সে গল্প না হয় আরেকদিন হবে। তবে ওই মাছের গন্ধ পেলে বোৰা যায় সেই তারা যারা শেওড়া গাছে থাকে, তারা কেন এই মাছটা

এত ভালোবাসে। তবে রান্না হওয়ার পরে আমার কোনও অসুবিধে নেই শুঁটকি থেতে, সেদিনও তাই খেলাম। আর ডাল, শাক, এসব তো ছিলই, শেষ পাতে লাল দই। এই লাল দইয়ের প্রসঙ্গে বলি, কলকাতায় এটা আমি জীবনে একবারই খেয়েছি বোধহয় এখন থেকে তিরিশ বছর আগে। তারপরে নানা বামেলায় আর কড়াকড়িতে লাল দই বানানো বন্ধ হয়ে গেছে কলকাতায়। সেই দই যে নিউ ইয়র্কের ব্রঙ্গ-এ তৈরী হয় সে কথা কে জানতো!

এর মধ্যে আরেকটা মজার ব্যাপার হল বাংলা বইয়ের দোকান। সেটাও যে দেশের বাইরে কোথাও পার ভাবতে পারিনি। “মুক্তধারা” দোকানে গিয়ে দেখলাম যা কালেকশন, তা কলকাতায়ও খুব বেশি পাওয়া যায় বলে মনে হয় না।

এত কিছু বলার কারণ হল পুজো যে এসে যাচ্ছে সেটা মনে হচ্ছে বলেই বোধহয় একটু শিকড়ে টানটা বেশি পড়ছে। পুজো এসে গেল বলেই মৃৎপ্রদীপেরও আবার বেরোনোর সময় হল। এবারের সংখ্যায় গল্প, মজার লেখা, ছবি, স্মৃতিচারণার সঙ্গে অন্যান্যবারের মতো রান্নাও দেওয়া হল। তবে প্রথমী যেমন ছোট হয়ে চলেছে তাই রান্নার মধ্যে বেশিরভাগটাই রাখা হল বাংলার বাইরের খাবার। এই সংখ্যায় দুটি নতুন জিনিস দেওয়া হল - একটি নতুন ভাষা শেখা। এবারে রাইল কোরিয়ান ভাষায় অল্প কথাবার্তা বলা। আর দ্বিতীয়টি একটি সাক্ষ্যাংকার। আশা করি আপনাদের সবার ভালো লাগবে।

সবার পুজো, লক্ষ্মীপুজো, কালীপুজো, ও ভাইকোঁটা আনন্দে কাটুক। সবাই আমার প্রণাম ও শুভেচ্ছা নেবেন। আবার দেখা হবে পয়লা বৈশাখ সংখ্যায়।



From the Warrior Goddess to a Bengali girl

Sayari Ghosh

Satyendra Nath Dutta, who is a Bengali poet very close to my heart, has remarked that we Bengalis have successfully transformed mighty Hindu gods and goddesses to be a part of our mortal families. The one dearest to Bengalis is definitely Goddess Durga.

Hindu mythology tells a different story. In one of the ancient epochs, the demon king Mahishasura got a boon from God Brahma which made the demon immortal. According to his wish that Brahma granted, no God, or man, or demon would ever be able to kill Mahishasura. This kind of a boon caused trouble because the powerful demon immediately drove the gods out of heaven and continued his rampage throughout heaven, hell, and earth. Ultimately the gods found out a tiny clause in his wish that he had missed. Even though he made sure to include all the different beings like man, god, demon, etc. he forgot to mention anything about a woman! The gods then decided to create a woman and send her to kill Mahishasura. This is what happens when someone underestimates the power of a woman. They end up getting killed by one! Goddess Durga was formed from energy that emitted from the bodies of the gods. So theoretically speaking she is not a real physical being. She is the epitome of power. She combines wealth, prosperity, beauty, grace, wisdom, speech, and supreme intellect along with being a warrior. With her mount, a lion, she waged a war against Mahishasura and after

three days of a violent struggle, finally vanquished him. The festival of Durga, that we call as Durga Pujo, is the time Lord Rama prayed to Durga to seek her blessings before he went to fight Ravana.



This warrior goddess, however is very distant to Bengalis. We cannot comprehend the fact that she was not real, or all the philosophy that goes with it. We have tried to bring her close to home. During this festival, married girls could come back to their parents' houses. So Bengalis decided to give Durga a more down to earth personality. In the houses of Bengal, in early autumn, Durga comes down as Uma, nothing more than a girl of the household. In philosophy, she is said to incorporate the beings of Goddess Lakshmi (wealth, prosperity, grace) and Goddess Saraswati (wisdom, learning, speech) but in Bengal, we turned Lakshmi and Saraswati into her daughters. Lord Ganesha and Lord

Kartik are her two sons, and the Lord Shiva her husband. She comes to her mortal home in the villages of Bengal, or in the dusty streets of Calcutta with her four young children in tow. The mighty goddess cries when she sees her mother after a year and complains to her about all the trouble her husband causes, and the hardships she faces at her husband's house.

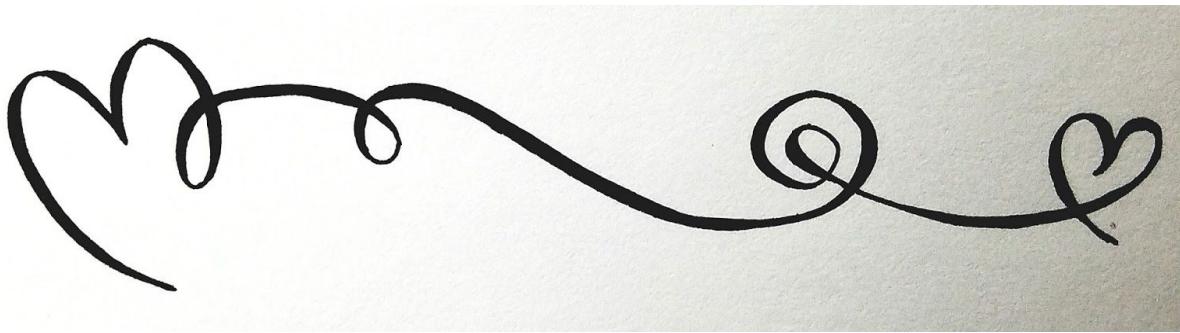
Bengali families also regard her just as their own daughter. In villages, the landlords believe that they are "bringing the girl home" when the festival starts. Uma is often referred to as the daughter, or girl. In some families the idol is decked with family jewelries that the girls of the household "share" with the goddess. One family

treats the goddess to a simple meal of rice and boiled vegetables for breakfast which is a favorite Bengali comfort food. She is treated with much love, which is rare in our interactions with gods and goddesses. On the day she leaves, she is fed sweets and her forehead is adorned with "sindur" (vermillion powder that married women put on their foreheads). It is said that her face reflects a sadness too, just like her mortal mother, aunts, and sisters.

This festival makes Bengalis all over the World feel a special tug at their roots. Wherever we may be, we feel close to home, close to our carefree childhood days, and cherish our families some more.



Bahubali - Srinika Roy (Age 6)



The First Independence Day

Smita Chowdhry

Memory is a funny thing playing tricks in the most inexplicable manner. A few days back while watching the Prime Minister hoisting the national flag at Red Fort, a quirk of memory suddenly took me back to 15th August 1947.

Looking back today I realize that my parents, my younger brother and I were the only members from both sides of our family to be present in Delhi on that fateful day. After seventy years, it certainly feels an important milestone in our lives. As my brother – now settled in Ottawa, Canada – remarked, he is probably the only Indian there today who was present in Delhi on that memorable day.

For some months before 15th August 1947, there had been a great excitement and though barely eleven, I realized that something very important was about to happen. The talks were mainly on Partition and Independence Day celebrations. A personal factor had crept in here. The fly past over India Gate that day was to be led by Squadron Leader H.N. Chatterjee – a great family friend and “Hiroo mama” to us. As far as memory serves, he flew to Jullender with his squadron and all of them flew in a formation on Independence Day.

My father belonged to the North Western Railway. Five divisions out of seven and its

headquarters in Lahore would henceforth be in Pakistan. The two remaining divisions now comprised the newly formed Eastern Punjab Railway or E.P.R. for short. The Chief Administrative Officer would be hoisting the flag on the Railway grounds. This gentleman though twenty years my father’s senior, was a very close friend with a great sense of humour. Shortly before the 15th of August, he along with my parents and a few other friends was discussing his speech for Independence Day. As we lived on Connaught Place, their impromptu gatherings were often held at our place. In the midst of the discussion, this aforesaid gentleman suddenly commented, “well since my wife will be there so perforce I shall have to address the gathering as ‘Bahaiyon aur Bahenon sewai Modi ki Amma’!” Modi was the name of his son. Everyone present burst out laughing.

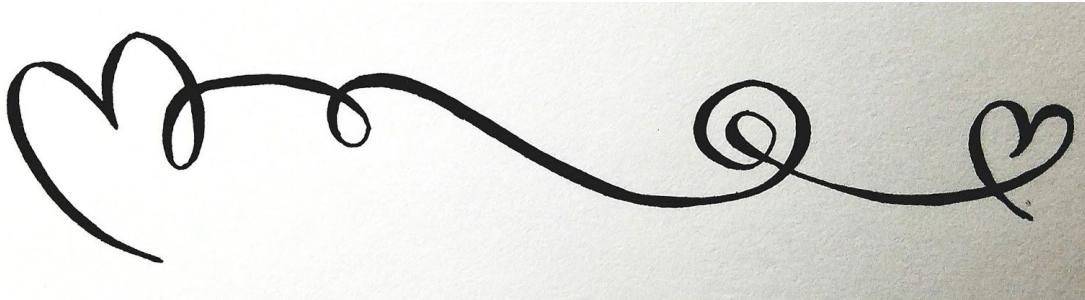
I was too young to stay up and listen to Pundit Nehru’s speech at midnight but my parents did. The next morning dawned bright and clear. We all tramped to the Railway grounds down Chelmsford Road for the flag hoisting. After the flag hoisting and a moving speech, we returned home. I had to go to school for the flag hoisting there. I do not know what the English nuns really felt but the ceremony was carried out with great fervour by the students.

After lunch, my father's friend Dr. S. L. Pramanik took his son Subir-*da*, my brother Prabir, and myself to the grounds opposite Red Fort where Pundit Nehru was to address a public gathering. He was greeted with a thunderous applause on arrival and he exhorted the people to strive forth in building a New India. Though I do not remember much of what he said but one thing stands vivid in my mind. It had been drizzling for

a while but just as Punditji began to speak, the rain stopped and the sun shone brightly through a parting in the clouds. A huge rainbow appeared in the sky just behind Punditji. There was a tumultuous cheering from the crowd who considered it a good omen for the future. Looking back I think they were right. After all, among so many upheavals, we have managed to remain a democracy.



Rainbow - Colin Savage (Age 4)



Pseudo-Science: The New Religion

Tim Snyder

Before going into this topic please take a moment to understand by definition the differences between science and pseudoscience:

Pseudoscience - A collection of beliefs or practices mistakenly regarded as being based on scientific method.

Science - The intellectual and practical activity encompassing the systematic study of the structure and behavior of the physical and natural world through observation and experiment.

Having the basic understanding of both of these, I would like to set the foundation of having you imagine as if you are in a classroom with 30 other students. Let us pretend that being a professor for dozens of years proudly placing my achieved PhD on my desk, I am about to present you with important historical “facts” that explains our history. While wearing my custom dark blue suit and round facial glasses to help present that I am authoritative and have great wisdom, I begin to explain my hypothesis. As I explain, I use many words such as “could”, “perhaps”, “possibly”, “believe” and most commonly the word “if”. Meaning, when I say, “**IF** this existed then **POSSIBLY** this **COULD** happen which **PERHAPS** causes my theory to be true. Based on these results I **BELIEVE** my theory is true and will publish my final conclusion as a scientific fact.”

However what happens when you begin to see evidence around the world that conflicts with my “X” theory? Does it matter? Let’s say that you provide evidence to the table, but I in return state that my personal stories and testimonials along with my scientific community are relied upon as “evidence”, and ignore the real evidence given and my hypothesis is eventually never abandoned.

As you continue to question my theories, I use excuses based on convoluted equations and specially invented terms that are vague to explain the failure of any scientific test you wish to see to prove any of my theories. Due to my detailed and complicated excuses, it cannot be reproduced or verified other than explaining in large ambiguous scientific terms that only a few others and myself can understand. Since I have the PhD in the subject (and you don’t), you are demanded to take my word for it.

That being said, I hand you a book to study that myself and the scientific community has agreed upon based on our beliefs. We indoctrinate the class around our agreed theories and have included these findings in the textbooks in front of you and teach them as if they are scientific facts.

But wait a minute. Last time I heard scientists always say that extraordinary claims require extraordinary proof! If you take a step back to what I have presented to you, are you learning and following science or pseudoscience? Does the method above

sound like a collection of beliefs or practices mistakenly regarded as being based on scientific method? Or does my teaching sound like intellectual and practical activity encompassing the systematic study of the structure and behavior of the physical and natural world through observation and experiment?

Sadly today, mainstream science has been replaced with pseudoscience and it is exactly what has filled our education system. Even though evidence has surfaced around the world, they refuse to disregard their statements. Nor will they adjust their theories from the new discoveries found. Why? Because it completely contradicts mainstream science and they will have to go back to square one and rewrite history and that is absolutely the last thing they would ever want to do. Let alone having the remote possibility admitting the existence of a divine creator, which would lead to a devastating and fatal blow to their scientific PhD ego.

Most assume because such theories come from mainstream science whatever they say must be true, without ever questioning the authenticity of these findings that actually prove their theories. In other words, we need to demand actual scientific evidence through experimentation and not on the consensus of "If 'X' existed, then we would see Y and Z." without science ever able to prove the existence of the missing foundation of "X" that their theory lays upon.

We simply just go along with it or we base other theories built on their theories. Many "facts" in science has become nothing more than pseudoscience giving the illusion that it is real science, which are then placed in our text books. Even though further evidence has been brought to the table, it has been rejected on the basis of contradicting the existing theories from mainstream science. This goes with Evolution that requires the missing link, the big bang "theory" where everything was created from nothing, earth's structured layers yet we can't dig past 8 miles and have to rely on observing the seismic waves, our geologic time scales contradict what we find today in

archeological discoveries found around the world and so on. Yet all of the evidence that is provided is shoved under the rug and is removed from mainstream science that should be up for debate. Why? Because again it contradicts EVERYTHING we have been taught growing up. Is that science or a cover up?

The world famous Nikola Tesla stated, "Today's scientists have substituted mathematics for experiments, and they wander off through equation after equation, and eventually build a structure which has no relation to reality."

As children we are taught about the scientific method and through science it uses careful observation and experimentation to confirm or reject a hypothesis. Any evidence against these theories and laws are searched for and studied closely, this is what makes science so amazing! Science can be an evolving knowledge base as we get better understanding of structures, archeological discoveries from more efficient and technical advancements in our tools! Furthermore reproducible results are required around experiments to prove their scientific theories as evidence and to publish the data. Lack of experimentation has no excuses that are acceptable. Neither can personal stories or testimonials be accepted as evidence. These are assumptions, not scientific facts! None of our existing theories can explain what or why light is the way it is nor do we know what gravity is. Einstein's theory of relativity and quantum mechanics both use the speed of light as a starting point. In other words they use an inexact measurement of the speed of light without explaining why it is, what it is or why the universe even has a speed limit in the first place. General relativity and quantum mechanics make good predictions, however they don't explain the fundamental constants. Meaning they have no clue what these are, but they can calculate against it; whatever it actually is.

We are lead to believe that thousands of years ago man was ignorant, naïve, and uneducated using a primitive toolset. Yet we find the complete opposite showing

advanced mathematics, geometry, unexplained architectural designs, physics, and of course astronomy around the world. This is a global phenomenon, yet mainstream science continues to believe that ancient scriptures are just myths and fairytales. Anyone who looks into this will find ancient texts that depicted amazing structures have now been found around the world proving further that ancient texts are not just fairy tales and myths but facts.

There are hundreds of scientific facts known today, that were depicted in ancient scriptures thousands of years ago. To further prove that biblical texts are not only historical logs of our ancient past but showcasing their knowledge and understanding of the universe, below I provided three basic examples of ancient Hebrew scripture depicting what we claimed to have discovered thousands of years later.

1) Our world's jet stream was anticipated at a time when it was thought that winds blew straight, where biblical scripture declares; "**The wind goes toward the south, and turns around to the north; The wind whirls about continually, and comes again on its circuit.**" King Solomon wrote this 3,000 years ago! Furthermore: "**Daniel said, "I was looking in my vision by night, and behold, the four winds of heaven were stirring up the great sea."**" Now not until around World War II was it then discovered the jet stream circuit. The 4 winds explained in scripture are what we know today as the 2 tropical and 2 sub-tropical jet streams on our planet.

2) Our hydrological cycle described four thousand years ago, "**For he maketh small the drops of water: they pour down rain according to the vapour thereof: Which the clouds do drop and distil upon man abundantly.**" And "**that calleth for the waters of the sea, and poureth them out upon the face of the earth.**" Meteorologists now understand that the hydrological cycle consists of evaporation, atmospheric transportation, distillation, and precipitation! Rainwater comes from the evaporation of the sea, just as the scripture states.

3) The ocean is very deep and the pressure at that depth is enormous. It would have been impossible for anyone in our ancient past to explore the springs of the sea unless they had equipment to do so. Ancient Hebrew scripture tells us: "**Hast thou entered into the springs of the sea? or hast thou walked in the search of the depth?**". Until recently, it was thought that oceans were fed only by rivers and rain, yet in the 1970's with the help of deep diving research submarines that were constructed to withstand 6,000 pounds-per-square-inch pressure; oceanographers discovered springs on the ocean floors, again what biblical records already depicted.

As you can see these are some very important statements made in Hebrew scripture where we are told they are nothing more than fairy tales and mythological book, yet they explain scientific facts that were supposedly discovered more recently. This further includes all the beautiful and amazing stories from India's ancient text describing their gods who helped them achieve and build such wonders, such as Dwarka, the lost city of Krishna as explained in the Mahabharata. Yet the arrogance in humanity and mainstream science today has brushed these discoveries aside, even though there has been physical archeological discoveries found proving such claims in ancient scripts existed.

Imagine if history books today were written excluding the Pyramids in Egypt, as if they were just depictions in ancient scriptures and were passed on as fairytales and myths. Then thousands of years later they were discovered proving the myths to be a reality however, mainstream science continued to block this information from entering into history books. This is exactly what is happening today with ancient and archaeological discoveries found all around the world that explicitly contradicts the theory of Evolution and much more; proving more and more biblical texts are true.

We were once told that man could not fly based on their scientific evidence and theories, yet here we are today knowing how that statement was incredibly wrong. We

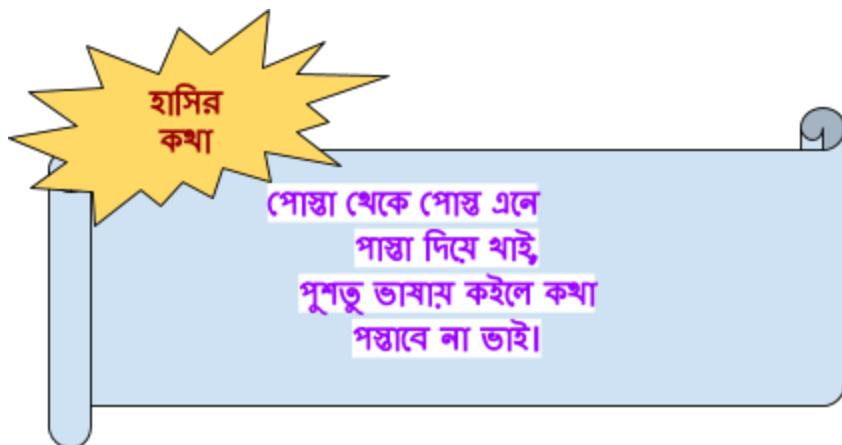
were told by science that the intense pressure in the uttermost depths of our ocean floor, that life could not exist. Yet life lives abundantly in the depths of the ocean floor in these extreme conditions once again proving science theories may be wrong.

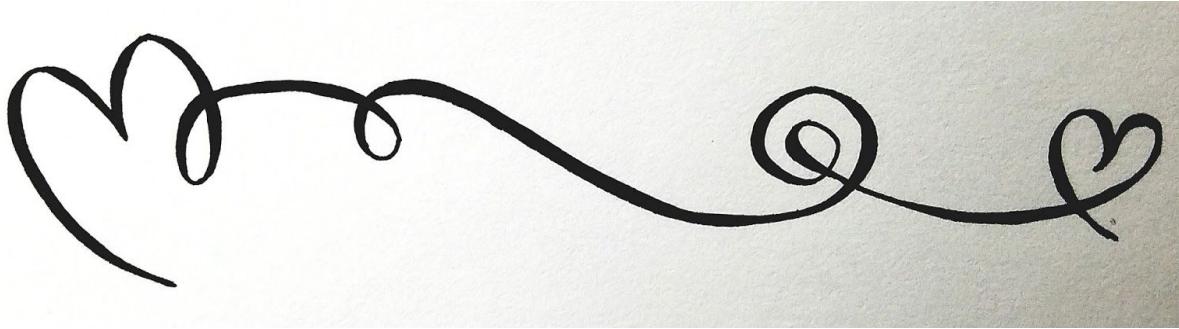
Since mainstream science has become more and more pseudoscience, it has become a religion in itself. If you do not agree with their theories or if you contradict, your ideas will be automatically thrown out. This is not science! What happened when we were allowed to throw crazy ideas and through observations and experimentations we could disprove or prove our hypothesis! This is no longer the case, even though we have physical evidence today that contradicts mainstream science theories they remain unchanged and not removed from books. We are still required to build new theories based on the foundation from their theories and anything outside of that will be rejected. Today we hear nothing but theories based on the principles of a big "if".

I think we can all agree assumptions are not proofs nor should they be excusable in the scientific community, yet here we are. Welcome to pseudoscience the new religion followed by mainstream science, where if you don't agree with their beliefs you are not a member of their community.

Do not let the arrogance of man use pseudoscience to substitute real science that exposes our history and the understanding of our universe. For we know that real science is used to discover our past, understand our present and research for our future.

So today we are left with two religions based on nothing more than personal beliefs, where both parties are pointing at each other mocking how incredibly ridiculous the other's belief system is. Either we believe in a divine creator or believe everything was created from nothing called the big bang. A divine creator or Big Bang theory; either side you choose they are equally without a doubt remarkably unbelievable.





আমাদের সময়ে খেলা

শান্তনু ঘোষ



আমার কিশোর বয়সে নানা ধরণের খেলাধূলোর কোন ঘাটতি ছিল না। সেটা indoorই হোক বা outdoor। এর একটা বড় কারণ আমাদের বাবা কাকারা নিজেরা ভীষণ ভাবে খেলাধূলো করতেন এবং খেলাধূলো ছেড়ে দেবার পরেও তার সঙ্গে জীবনভোর

জড়িয়েছিলেন। সেই অর্থে পরবর্তী প্রজন্মে আমি সামান্য ছলেও খেলাধূলোর সঙ্গে কিছুদিন বেশ ভাল ভাবেই যুক্ত ছিলাম। তারপরে একদম অন্য পিঠে অবস্থান নিলাম, এমনকি খেলা দেখাও ছেড়ে দিলাম।

আমাদের বাড়ির সামনে চওড়া ফুটপাত এবং বাড়ির আশেপাশের খালি জমিতে তখনও বাড়ি না হওয়ার সুবাদে আমাদের নানারকম খেলার মৌরসি পাট্টা অবাধ গতিতে চলত। ফুটবল খেলাটা আমার শুরু রেডিওতে ফুটবল লীগের ম্যাচের ধারা বিবরণী শুনে ও গড়ের মাঠে গিয়ে বড় ক্লাবের ম্যাচ খেলা দেখে।

বাড়িতে দাদা আর আমি কাপড়ের পুটলি দিয়ে বল তৈরি করে দোতলার দালানে খুব দৌড় ঝাঁপ করে খেলতাম। দাদা বরাবরই মোহনবাগানের supporter ছিল আর আমি তখন ইস্টবেঙ্গলের ছিলাম, কারণ আমার আদর্শ তখন আহমেদ খান। ভারতবর্ষে অতবড় skill player আর জন্মান নি। এমন কি চুনী গোষ্ঠীও নয়। তবে আহমেদ খানের থেকে চুনী গোষ্ঠী অনেক বেশি effective ছিলেন কারণ with the ball movement এ

চুনী অনেক ফাস্ট ছিলেন। আর খুব ভাল volley shot ও নিতে পারতেন। এটা অবশ্য আমার বিশ্বেষণ। পরের প্রজন্মে যাঁরা এসেছেন তাঁদের মধ্যে কাজল মুখার্জি, কৃশানু দে, মোহম্মদ আকবর, শ্যাম থাপা প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ফিরে যাই নিজের ফুটবল খেলা প্রসঙ্গে। এরকম ভাবেই কাটছে তখন একদিন হঠাৎ একটা ছোটদের ফুটবল টুর্নামেন্টে খেলার জন্য ডাক পেলাম। আমারই বন্ধু পথিকের দাদার টিমের হয়ে খেলতে হবে। দলের অন্য সদস্যদের আমি কারুকে চিনতাম না। খেলাটা হচ্ছিল নন্দলাল জিউ রোডে শান্তি সংঘের মাঠ। এটা আগে একটা পাঁকের পুরু ছিল। স্থানীয় গোয়ালাদের মোষগুলো গরমকালে গলা অন্দি জলে ডুবিয়ে এখানে অবস্থান করতো। যাই হোক, খেলার মধ্যে যথেষ্ট উদ্দীপনার সঞ্চার হত দু দল সমর্থকদের উদ্দম গোলাবাজিতে। বেশ মনে আছে প্রথম দিন আমরা জিতে ছিলাম। পরের রাউন্ডের ম্যাচ খেলতে গেছি আরেকদিন। সেদিন সারাক্ষণ একটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে আমাকে বার বার উৎসাহিত করা হচ্ছিল নিজে তুকে গিয়ে গোল করতে, বল গোলমুখে অন্যকে না বাড়িয়ে। সেদিন কিন্তু আমরা ম্যাচটা ১-০ গোলে হেরে গিয়েছিলাম।

খেলাশেষে যখন জামাকাপড়, খেলার বুট খুলছি, তখন একজন বছর কুড়ি বয়েসের যুবক সঙ্গে আমারই কাছাকাছি বয়েসের কয়েকজন ছেলেকে নিয়ে আমার কাছে এলেন। উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন বার বার কেন আমি গোলের কাছে গিয়ে বল পাস করে দিচ্ছিলাম। আমি বললাম যে অত পেছন থেকে বল dribble করে টেনে নিয়ে গিয়ে আর ফিনিশ করতে পারছিলাম না তাই অন্যকে সেই দায়িত্বটা দিচ্ছিলাম। আসলে ওটা আমার খেলার সীমাবদ্ধতা।

তারপরেই উনি বললেন "ঠিক আছে, তুমি তো কোনো ক্লাবে খেলনা, আমাদের ক্লাবে খেলবে? আমাদের ক্লাবের নাম প্রাত্ত সংঘ।" ছোটদের ভাল ফুটবল ক্লাব হিসাবে তখন যথেষ্ট সমীক্ষা জাগান নাম আর ওই ক্লাবের কয়ক জনের সঙ্গে একই স্কুলে পড়ার সূত্রে বা অন্য হিসাবে পূর্বেই পরিচয় ছিল। তাই এক কথায় রাজি হয়ে গেলাম। যে যুবক সেদিন আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন তিনি হচ্ছেন সমারদা - পুরো নাম সমরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। ক্লাবের তিনি একাধারে ছিলেন প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি, কোষাধৰ্ষ্য ও কোচ।

সেই সময় বিজ্ঞান ভিত্তিক ফুটবল ট্রেনিং সারাংশ কলকাতা শহরেই বিরল ছিল। এমনকি গড়ের মার্ঠের নামকরা বিখ্যাত ক্লাবগুলোকে ধরলেও। ওই রকম সময়ে সমরদাই খেলার মধ্যে বিজ্ঞান ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রয়োগের কথা চিন্তা করেন। এ ব্যাপারে তাঁকে pioneer ভাবাটা মোটেই অতিরিক্ত নয়। তিনি পশ্চিম দেশের ফুটবল ট্রেনিং এর অনেক বই ও ছবিওয়ালা লিফলেট জোগাড় করে আমাদের সেইমত করতে শেখাতেন। এমনকি পায়ের পজিশন এবং শরীরের বাঁক নেওয়া পর্যন্ত করে দেখিয়ে দিতেন। খেলার মধ্যে সেইসব কলা কৌশলের প্রয়োগ দেখার জন্য পরবর্তী কালে অনেক নামকরা খেলোয়াড়ও আমাদের খেলা দেখার জন্য মাঠে আসতেন। ভারতীয় দলের সেই সময়ের একজন প্রখ্যাত খেলোয়াড়, পরবর্তী কালের অধিনায়ক চুনী গোস্বামী তাঁদের মধ্যে একজন। আর একটা কারণ অবশ্য ছিল, ওনার ঠিক পরের ভাই বেনু গোস্বামী আমাদের ক্লাবের খেলতেন এবং ক্যাপ্টেন ছিলেন। খেলোয়াড় হিসাবে যে তিনি খুব বড় ছিলেন তা নয়, কিন্তু ক্যাপ্টেন হওয়ার জন্য যে স্মার্টনেস থাকা দরকার তা তাঁর একটু বেশি পরিমাণেই ছিল। পরবর্তীকালে উনি যাদবপুর ইঞ্জীনীরিং কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিকেট ক্যাপ্টেন হয়েছিলেন। ফুটবলটাও খেলতেন।

যাকগে, খেলার কথায় ফিরি। সমরদার ট্রেনিংটা অর্থাৎ খেলার ঘরানাটা ছিল হাঙ্গেরী দেশের খেলার ধরণের। হাঙ্গেরী দলের পুস্কাসের খেলার ধরণ ছিল অতিশয় উচ্চস্তরের এবং তিনি খেলতেনও অতি চমৎকার। এইজন্য সারা পৃথিবীব্যাপী তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল খুব বেশি, যেমন আজকের মেসী, রোনালডো কে নিয়ে হচ্ছে। তখন তো এতো প্রচার ছিল না এবং টেলিভিশন ও সব দেশে ছিল না। তাই ব্যাপারটা একটু চাপা ছিল।

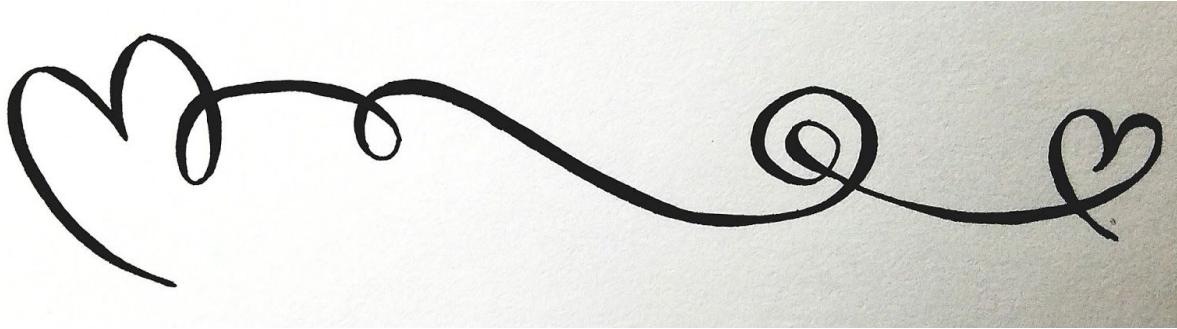
আমরাও সমরদার নির্দেশ মতো আমাদের খেলার ধরণ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়াম প্রত্তুতি অভ্যাস করতাম। আর একবার ফুটবল season শুরু হয়ে গেলে অর্থাৎ জুন মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত প্রায় প্রতিদিন বা একদিন অন্তরেই

টুর্নামেন্ট ম্যাচ খেলতে হত। কত টুর্নামেন্ট যে হত তখন, এখন সে সবের কোন অস্তিত্বও খুঁজে পাওয়া যাবেনা। এখন যেমন বয়স ভিত্তিক বিভিন্ন স্পোর্টসের রাজ্য বা জাতীয় প্রতিযোগিতা হয়, তখন এরকম বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন উচ্চতার ছেলেদের নিয়ে ফুটবল প্রতিযোগিতা হত। যেমন, ৪ফুট ৮ ইঞ্চি, ৪ ফুট ১০ ইঞ্চি, ৫ ফুট, ৫ফুট ৩ ইঞ্চি এবং open to all অর্থাৎ বড়দের যোগদান। Open to all ফ্রপ টা বাদ দিলে অন্যগুলো সব সাত জনের দল করে খেলা হত। মার্ঠের মাপ ও অনেক ছোট হত, কারণ বেশিরভাগ পাড়া টুর্নামেন্টই হত বাড়ি না হওয়া থালি প্লটে, দু তিনটে বাড়ির জমি নিয়ে তৈরি। দক্ষিণ কলিকাতায় open to all টুর্নামেন্ট ছিল South Calcutta Federation League। এর খেলা হত এখন যেখানে রবীন্দ্র সরোবর stadium হয়েছে সেখানে। Lake East আর Lake West বলে দুটা মাঠ ছিল। ১৯৬০-৬১ সাল নাগাদ তদানীন্তন Calcutta Improvement Trust এর চেয়ারম্যান ICS শ্রী শৈবাল গুপ্ত মহাশয়ের প্রকাণ্ড প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে বর্তমান stadium টি। ১৯৬৪ সালে এখানে India-Iran Pre-Olympic ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পারিপার্শ্বিক মানুষের আপত্তিতে এখানে সে রকম ভাবে stadium টিকে কোন দিনই কাজে লাগান যায় নি।

Stadium হওয়ার জন্য এই মাঠ দুটো ছেড়ে নতুন মাঠ Lake New হল যেটার অবস্থান ছিল লেক ক্যাম্পের কাছে। Federation League এর খেলা তখন ভাগ করে কিছু Lake New মাঠে আর কিছু দেশপ্রিয় পার্কে হত। এই Federation League এ অনেক ক্লাব খেলত। সত্য বলতে কি, গড়ের মার্ঠের বড় ও মাঝারি ক্লাবগুলোর প্লেয়ারের চাহিদা খুব বেশি ভাবেই মেটাত এই ক্লাব গুলিতে খেলা ছেলেরা। এমনকি ভারতীয় দলের অনেক খেলোয়াড়, অধিনায়কও এই মাঠ থেকে প্রথম আঞ্চলিক করেছে। এই মুহূর্তে আমি দুজনের নাম বলছি - একজন হচ্ছে Ballygunge Institute এর চুনী গোস্বামী ও আরেকজন মিত্র সন্ধিলীনীর সুনীল ভট্টাচার্য (লালটু)। এঁরা ভারতীয় দলের অধিনায়ক ছিলেন।

আমি যে ক্লাবে খেলতাম সেখান থেকে প্রিয়লাল মজুমদার ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে দিয়েছেন। সমীর ব্যানার্জি বাংলা রাজ্য দলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। অবশ্যই তাঁরা সে সময় প্রাত্তসংঘ ক্লাবে খেলতেন না।

লিখতে গিয়ে আরো অনেক কথা মনে আসছে। কিন্তু আর নয় - পাঠকের ধৈর্যচূড়ি ঘটবে - হয়তো সত্য ঘটে গেছে।



একটি পথের আঘাত

প্রগতি ঘোষ



আমি একটি পথ। কবে আমার জন্ম হল, কি করে আমার জন্ম হল কিছুই জানিনা। যারা আমাকে জন্মাতে দেখেছে তাদের কাছে শুনেছি এই জায়গাটা না কি বনে - জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। রাত্রি বেলা শিয়ালের ডাক, বিঁৰি পোকার ডাক শোনা যেত। এমনকি মনোহর ডাকাত তার সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াত।

ইংরেজরাই মনে হয় বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে আমাকে আবিষ্কার করেছিল এবং নাম দিয়েছিল 'ল্যান্ডডাউন রোড'। আমার সীমানা ছিল মিন্টো পার্কের সামনে থেকে। আমার দুধারের বাড়িগুলি ছিল অনেক জমি নিয়ে গরাদ বিহীন বিশাল জানালাওয়ালা, দোতলা বাড়ি। সে সব বাড়িগুলি অধিকাংশই ভেঙে নতুন নতুন আকাশচূম্বী স্ল্যাট বাড়ি তৈরী হয়েছে। জেগে আছে কেবল নাটোরের মহারাজার বাড়ি আর ডায়োসেশান আর হাঁটু স্কুল বাড়ি। আমার পশ্চিম দিকে আশুতোষ-শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড আর পূর্ব দিকে গড়িয়াহাট রোডকে সমান্তরালে রেখে একেবারে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে ঢাকুরিয়া লেকে গিয়ে শেষ হয়েছে। মনোহর পুরুর রোড পর্যন্ত কয়েকটা বাড়ি ছিল তারপর বন-জঙ্গলে ভর্তি ছিল এই স্থান। ১৯৩০ সাল নাগাদ কি তার কিছু আগে কলিকাতা 'ইম্প্রভুমেন্ট ট্রাস্ট' এর সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার শ্রী জে. এন. দাশগুপ্তের নেতৃত্বে আবার আমার পথ ঢেকে শুরু।

১৯৭৫-৭৬ সালের কথা বলছি যখন আমার কৈশোর কাল, তখন আমি শীর্ণকায় ছিলাম। আমার দুই ধারে চওড়া দুটি ফুটপাথ ছিল। ছেলেরা ওই ফুটপাথে 'ক্রিকেট', 'ব্যাডমিন্টন', ইত্যাদি খেলত। আমার বুকের ওপর দিয়ে তখন ৮বি, ৮৭ ও ৮৭এ বাস যাতায়াত করত। পথের ধারে ধারে অশ্বথ, রাধাচূড়া, কৃষ্ণচূড়া, বকুল ফুলের গাছ ছিল। সবুজ

কচি ঘাস আমার দেহকে ঠান্ডা রাখত। ক্রমে দিন যায় - হঠাৎ একদিন শুনলাম আমার নাকি কলেবর বৃদ্ধি হবে। আমার পাশের দুই ফুটপাথ কেটে আমাকে চওড়া করা হবে। শুনলাম কলকাতা নাকি 'তিলোত্তমা' হবে। আমি তো কলকাতারই একটা অঙ্গ, তাই আমাকে সাজান হল। পথের দুই পাশে বড় বড় গাছের চারা লাগান হল - যা এখন মহীরুহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ল্যাম্পপোস্টের মাথায় তিনটি করে আলো লাগান হল। এ ছাড়া 'ভেপার' লাইট তো ছিলই। ল্যাম্পপোস্টের গায়ে নীল পুঁতির আলোর মালা জড়িয়ে দেওয়া হল। এখন আমার ভরা যৌবন - এখন আমার বিপুল কলেবর। আমার দু পাশে হাসপাতাল, নার্সিংহোম, ওষুধের দোকান, বড় বড় বিল্ডিং, মল, বাজার, দোকান হয়েছে। আমার ঠিক বুকের মাঝখাল দিয়ে ডিভাইডার করে তার ওপর লাল, সাদা, হলদে রঙের ফুলের চারা গাছ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। মাঝে মাঝে নীল-সাদা রেলিং দিয়ে আমাকে সাজান হয়েছে। সত্যি আমি যেন নীলাঞ্চলী শাড়ি পরে সকলকে আঢ়ান জানাচ্ছি। রাস্তার মোড়ে মোড়ে মির্ঠ সুরে রবীন্দ্রসংগীতের সুর বাজে। সুদৃশ্য ইনডিকেটর লাগান হয়েছে রাস্তা পারাপারের জন্যে। এখন আমার বোলবোলাও অবস্থা। আমার একটি নামকরণ হয়েছে 'শরৎ বোস রোড'। এখন আমার কাজও বেড়ে গেছে - বিভিন্ন রকম গাড়ি, বাস, ট্যাক্সি, অ্যাস্বুলেন্স, স্কুটার, মোটরসাইকেল, বড় বড় ট্রাক, ইত্যাদি যানবাহন আমার বুকের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে। এখন আমি 'রাজপথ'। দেশের বড় বড় নেতা, মন্ত্রী siren বাজিয়ে আমার ওপর দিয়েই যায়। সত্যি আমি সুন্দরী একটি রাজপথ।

কিন্তু কিছু লোক আমার সৌন্দর্য কে সহ্য করতে পারল না। তিনমাথার মোড়ে রাজ্যের জঙ্গাল কেলে আমাকে কদর্য করে তুলল। সকালবেলা শহরের সব নোংরা, নর্দমার পাঁক এনে ওই জায়গায় কেলতে লাগল। যে রাস্তা এত ব্যস্ত, এত দরকারি, তাকে নোংরা দিয়ে কদর্য করে তুলল। মানুষ

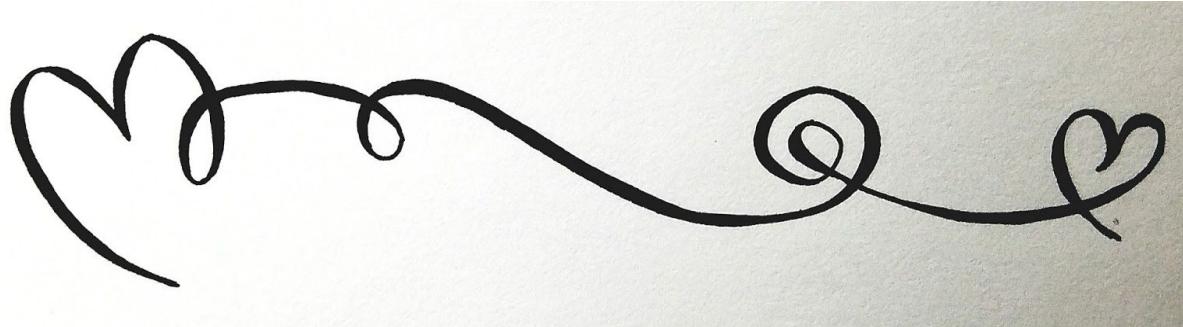
অভ্যাসের দাস। তাই নাকে কাপড় দিয়ে ওই স্থান পার হচ্ছে, যানবাহনগুলো অতি সহর্পনে একপাশ দিয়ে জায়গাটি অতিক্রম করছে কিন্তু কেউ কোন প্রতিবাদ করেনো। মানুষ যেন প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। তাই যার যা খুশি ফুটপাথের ওপরে তেলে ভাজার দোকান, চপ-কাটলেটের দোকান, চায়ের দোকান, লুচি-ভাত রান্না করে মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করেছে। এমনকি ট্রিপল টাঙ্গিয়ে পুত্র-পুরিবার নিয়ে বসবাস করছে। আমার খুব কষ্ট হয়।

বয়স তো আমার এগিয়েই যায়। আমার দেহের চারিদিকে এখন ক্ষতর সৃষ্টি হয়েছে। আমার দেহের যত্ন সেইভাবে কেউ নিয়ে নেয় না। আগে একটা জলের গাঢ়ি এসে আমাকে স্লান করিয়ে দিয়ে যেত, এখন তাও কেউ করেনো। তবে মিথ্যে বলব না - পুজোর সময় রাস্তায় পিচ ও খোয়া মিশিয়ে নিয়ে আমার ক্ষতস্থানে তালি লাগিয়ে চিকিৎসা করা

হয়। মহীনৱহণ্ডিলির পুজোর ছাঁট দেওয়া হয়, কারণ আমার উপর দিয়েই তো শহরের বড় বড় প্রতিমা বিসর্জন হবে।

এখন আমার দুটি রূপ। সকালবেলা নানারকম হর্নের আওয়াজ, এঙ্গুল্যাস্ত্রের শব্দ, siren এর শব্দ ইত্যাদিতে একটা প্রিকতান ওঠে - অবশ্য তাকে 'শব্দ দূষণ' বললেই ঠিক হয়। রাত্রিবেলাতেও মাস্তানৱা বেরিয়ে পড়ে মোটরসাইকেল নিয়ে তাদের কেরামতি দেখতে - কে কত শব্দ করে কত দ্রুত গতিতে এগিয়ে যেতে পারে। পথের সারমেয়রা, যারা আমাদের পাহারা দেয়, তারা তারস্বরে চিংকার করে প্রতিবাদ জানাই কিন্তু কে শোনে কার কথা ! এই ভাবে দিনে-রাতে আমার বিশ্রাম নেই। ভাঙ্গা গড়া নিয়েই তো জীবন। একজন গড়ে আর একজন ভাঙ্গে। ক্রমেই বুঝে হয়ে পড়ছি, এত ভার আর সহ্য করতে পারছিনা। ভার লাঘব করাবার জন্যে মানুষ কি চিন্তা করছে সেই আশায় অপেক্ষা করছি।





The 7 dots.....

Arnab Roy

Once upon a time ago there was a kid who loved animation. He was so fond of a specific animation series, that he used to be spellbound when it started and would not move until it ended. I was that kid and the animation series was **Spiderman**.

In India, at that time, people had 14 inch black and white television sets. For my entire life in India, I had to watch the same TV and believe me, the absence of color or other visual effects never reduced my joy of watching it.. In fact it excited me about science and motivated me to become an engineer. As Steve Jobs says, it is about connecting the dots and I will try to connect the 7 dots of my life.



All of the 7 TV series in this document are American. They were produced mostly during 60s through 80s and were broadcast by some Indian and Bangladeshi TV channels.

Everyone knows **Spider Man**. He is now even part of The Avengers. But this animation was during the time when he used to fight crime alone in New York city streets.

I still remember the title theme of Spiderman when he came down from The Empire State building and go around the city saving people.

He was truly the 'friendly neighborhood Spider Man' as said in the title song.



A few years later I met **He-Man**. He-Man is the principal character of a series of comic books and several animated television series, characterized by his superhuman strength. In most variations, he is the alter ego of **Prince Adam**. I was fascinated by the character **Orko** and his magical powers. Many years later I could relate **Orko** to **Jedi** (from Star Wars) as both are magical and humorous in their own aspects.



Parallel to watching He-Man, I fell in love with Disney cartoons. I have watched almost all of them that have been broadcast till date! I still remember my excitement watching **Ducktales**, specially Huey, Dewey and Louie, the 3 nephews of Donald Duck. This interested me to read books on how to draw cartoons. When I learned that for each individual scene, animation artists have to draw hundreds of drawings and flip them fast to give the dynamic effect, my respect for them increased by ten folds. I even

dreamed of working in Walt Disney's cartoon studios all day.

After a few years **Johnny Sokko and his Flying Robot** showed interesting engineering gadgets. It was a robotic series where a young Japanese boy used to save the world with the help of his flying robot.



Though the picture quality was not great according to modern standards, the most exciting part was this boy's communication system. It was his watch! He used to control every action by giving commands through his watch. It was simply great to get lost in those exciting science fiction ideas which I wish will come true in future with Apple watch and other interesting devices.



When I was a teenager, I started watching **Macgyver**. This series revolved around a middle aged man whose name is MacGyver. His main asset is his practical application of scientific knowledge and inventive use of common items lying around along with his ever-present Swiss Army knife, duct tape and occasionally matches.

In later years when I was working at Microsoft, I found that people use the term **MacGyverism** which means finding solutions for any difficult problem with existing toolset or hacking few lines of code. The best part of MacGyver as a character is his use of common sense and his knowledge of chemistry, physics, technology, and sportsmanship to resolve what are often life-or-death crises. He created solutions from simple items for these problems.

Next is Street Hawk. This was a story of a retired cop who used to ride a special Artificial

Intelligent motorcycle to stop crime in California. Jesse Mach, an ex-motorcycle cop, injured in the line of duty became a police troubleshooter and he was recruited for a top secret government mission to ride Street Hawk.



The central attraction in this series is this motorcycle named Street Hawk which was an all-terrain attack motorcycle designed to fight urban crime, capable of incredible speeds up to three hundred miles an hour, and immense firepower.

As is said in the intro, it was truly **the man, the machine, street hawk!**

Last but not least on my list is **Knight Rider**. The story revolves around a detective lieutenant Michael Arthur who was saved by self made billionaire Winston Knight after an accident. He was dead to the entire world but got a new identity (Michael Knight) and a new mission to end crime with the help of Artificial Intelligent car called **KITT**.



KITT was actually a heavily modified, technologically advanced Pontiac Firebird with numerous features including an extremely durable shell and frame, controlled by a computer with artificial intelligence.

It was like Siri or Alexa with a better AI embedded and could self drive better than Tesla! I believe all these products were somehow influenced by KITT.

These inspired me enough to take up **Computer Science** as my career.

Photos: Google Images



অথ শ্রী মার্জার কথা

(নামকরণে শিরাম চক্রবর্তীর খন স্থাকার করলাম)

সুচিতা ঘোষ

গেরস্থ মানুষের যারা কাছের পুষ্যি তাদের মধ্যে বেড়াল জাতির তল পাওয়া ভার। "অবোলা" জীবের ভাষা আমাদের জানা না থাকলেও তো 'body language' বলে একটা কথা আছে। কুকুরের পছন্দের লোক হলে নেচে-কুঁদে, মুখ চেটে, ল্যাজ নেড়ে যেমন জানান দেয় তেমনই অপছন্দের হলে চিক্কার করে তেড়ে শিয়ে পাড়া মাথায় করতেও দেরি করে না। কিন্তু বেড়ালের মনস্ত্ব খুবই জটিল। ছোটবেলায় মিষ্টি মুখে 'মিউ মিউ' করে আদর কাড়লেও বড় হলে তাদের বোঝা দায়। তারা কখন ভালোবাসে (এটার জন্যে অবশ্য বড় একটা প্রশ্ন আছে), কখন রাগ করে আর নরম থাবার মধ্যে লুকিয়ে থাকা নথে শান দিয়ে হঠাত আক্রমণ করে তা জানা মানুষের কঢ়ো নয়। ওদের মতো স্বাধীনচেতা এবং দুনিয়াকে 'ডোন্ট কেয়ার' করা জীব বড় একটা দেখা যায় না। মানুষ কে ওরা 'মানুষ' বলে গণ্যি করেনা, ওদের 'প্রজা' হিসেবেই দেখে। তবে ওরা মাঝে মাঝে ভয় ও পায়। সত্যি আমার নিজের চোখেই দেখে।

বছর ৩০/৩৫ আগের কথা। সেই সময় আমাদের বাড়ির আশে পাশে বেশ কিছু বেড়ালের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। পাশের গলিতে মাঝারাতে যখন বেড়ালদের রণ হঙ্কার শোনা যেত তখন ঘুমোয় কার সাধ্যি। ওই বাড়িতে থাকা পরাগের বাবা তো একবার পুলিশের 'জল কামান' দেওয়ার কায়দায় এক বালতি জল যুব্ধানদের গায়ে ঢেলে ছ্রত্বঙ্গ করেছিলেন। দিলের বেলাতেও ওদের উপদ্রব কম ছিল না। যখন একতলার সিঁড়ির নিচে ছোট জানলার মাথার ফাঁকে কাঠের টুকরো লাগিয়ে ওদের আসা যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করার ব্যবস্থা হল, তখন এক দোর্দওপ্রতাপ হলো সোজা গটগটিয়ে সিঁড়ি দিয়েই ওঠা শুরু করল। অবশ্য নামবার সময় আমরা তাড়া করলে ওকে একটু দোড়েই নামতে হত। সঙ্ক্ষেবেলায় দোতলার মাঝের ঘরে সবাই সিনেমা দেখতে ব্যস্ত (তখন তো ওই সঙ্ক্ষে থেকে

রাত পর্যন্তই চলত দূরদর্শন) তার ভেতরই হলো বাবাজি রেঁদে এলেন। কেউ হয়ত জল খেতে দালানে এসে চমকে উঠে বিষম-টিয়ম খেয়ে হৈ চৈ লাগিয়ে দিল আর বাকিরা সুচিত্রা-উত্তম ছেড়ে লাঠি সেঁটা হাতে ধর পাকড় শুরু করে দিল। সঙ্ক্ষেটাই নষ্ট।

এনাকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্যে আমাদের কাজের (ও অকাজের) ছেলে শিশু একটা 'প্লান' করল। হলো দোতলায় উঠলে ওকে তাড়া করে পেছন দিকের সরু বারান্দায় নিয়ে ফেলতে হবে। যখন রেলিঙের ফাঁক দিয়ে লাফ মারবে তখন শিশু নিচে বড় বাঁশ নিয়ে ওকে পিটিয়ে পাড়া ছাড়া করার জন্যে তৈরী থাকবে। সেদিন মাস্তানকে তাড়া দিয়ে আমি ঠিকই এনেছিলাম এবং রেলিঙের ফাঁকে আটকে যাওয়া মোটা পশ্চাত্দেশে একটা হাতপাখার ডাঁটি (যার পাখা গুলো হাওয়া হয়ে গিয়েছিল আর ডাঁটি ব্যবহার করা হত জামা-কাপড় কাচার গরম জলে সাবান গোলার জন্যে) দিয়ে এক ধা বসিয়েওছিলাম এবং সে লাফও মেরেছিল। কিন্তু শিশুর হিসেবে মতো মাটিতে না পড়ে, মাটি থেকে bounce করে আবার লাফ দিয়ে মিস্ট্রির ঘরে টিনের চালের ওপর পড়ে পেছনের পাঁচিল পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর শিশুর বাঁশ পড়ল নিচের তলার গোকুলবাবুদের টানটান করে দড়িতে মেলা একরাশ কাচা জামাকাপড়ের ওপর। তখন যদি আজকের মতো চটেজলদি ছবি তোলার ব্যবস্থা থাকলে শিশু গোকুলবাবু ও তাঁর গিন্ধির এবং মাটি ও শ্যাওলায় মাথামাথি কাপড়গুলোর যা একটা চমৎকার কোলাজ হত সে আর বলার নয়।

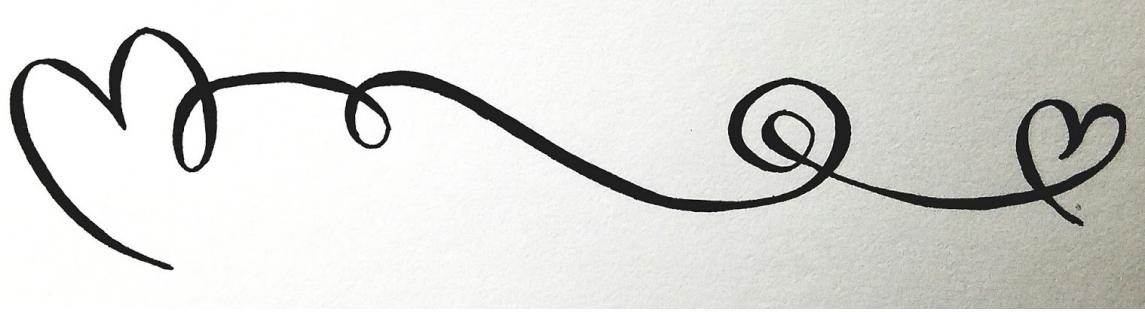
তবে এ হেন দুর্ধর্ষ হলোও একদিন প্রচন্ড ভয় পেয়েছিল। আমাদের বাড়ির গায়ে লাগান নলবাবুর বাড়ির যে গলিতে ওদের নৈশ সঙ্গীত চর্চার/ঝগড়ার আসর বসত সেই বাড়ির ছাদ থেকে একদিন লাগাতার বিকট 'ম্যাও ম্যাও' ডাক শোনা

যেতে লাগল। সবাই খেঁজাখুঁজি করতে শুরু করল আর শেষে দেখা গেল তিন তলার আলমের ওপর বসে সে ডাকাডাকি করছে। কি করে ওখানে পৌঁছল কে জানে - তবে এখন নিরূপায় হয়ে কাতর কষ্টে আবেদন জানাচ্ছে। ছাদের পাঁচিলের ওপর থেকে দেখতে গেলেই সে এদিক থেকে ওদিক চলে যাচ্ছে। কেউ ধরে তুলে আনবে কি করে? আমাদের বাড়ির তিন তলার জানালার এবং চার তলার ছাদের দর্শকবৃন্দ নানা রকম পরামর্শ দিতে লাগল - হলোকে নয় - উদ্ধারকারীদের। কিন্তু কিছুই ফল হল না। শেষ মেষ নন্দবাবুর কাজের ছেলে দুলালকে তুতিয়ে পাতিয়ে কানিশে নামানো হল। পরাগের মা একটা বড় তোয়ালে দিলেন মূর্তিমানকে চাপা দিয়ে তবে তুলে আনার জন্যে। বহু কষ্টে

দুলাল সেই অসাধ্য সাধন করল আর তোয়ালে মুড়ে হলোকে ছাদের ওপর তুলল। কিন্তু মুহূর্ত মধ্যে মোড়ক থেকে বার হয়ে সে অন্য দিকের আলমেতে আবার ঝাঁপ দিল। বোঝা গেল যে ভয়ে দিশেহারা হয়েই সে এমনটা করছে। আবার যখন দুলালকে উৎসাহিত করে ওই দিকের আলমেতে নামাবার চেষ্টা চলছে, তখনি হঠাত বাবাজি এক মরণ ঝাঁপ মারল আর আমাদের সমবেত "গেল গেল" চিকারের মধ্যেই সামনের সরু সুপুরি গাছ বেয়ে সড়সড় করে নিচের ফুটপাথে নেবে ভোঁ দৌড় দিল। তাই যদি পারবি তা হলে এত ঝামেলার কি দরকার ছিল? কিন্তু কে দেবে এর জবাব? একমাত্র প্রফেসর শঙ্কুর 'লিঙ্গুয়াগ্রাফ' যন্ত্রের সহায় পেলে হয়ত জানা যেত। (নবনীতা দেবমেনের লেখা এক গল্পেও এই রকম ঘটনার কথা আছে - অর্থাৎ হলোরা মনে হয় এরকম করেই থাকে।)



ছবি: সায়নী ঘোষ



সীমানা ছাড়িয়ে

রীতা ঘোষ

আজ সকাল থেকেই মেঘের ছায়া পড়ছে দূরের পাহাড়ের গায়ে। পাহাড়ের ছাট শহর। চড়াই এর ধাপে ধাপে কোম্পানির বাংলাগুলো ছবির মতো সাজানো। আমাদেরটা অনেকটা ওপরের দিকে, তাই নিচের দিকে তাকালে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায় পিচের রাস্তাটা ক্রমশ নেমে গেছে। দুপুরে খাবার টেবিলে বসে দেখছিলাম দূরের পাহাড় আস্তে আস্তে ঝাপসা হয়ে আসছে, শুধু তার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা লাল ফুলে ভরা গাঁটার ঝঁকড়া মাথাটা তখনো বেশ স্পষ্ট। কিন্তু এখন বিকেলে সবই কেমন ঝাপসা, মেদুব, বিষপ লাগছে। কাজের মেঝেটা কাজ সেবে ছ্রি রাস্তা দিয়ে খানিক ছুটে, খানিক হেঁটে নিচে নেমে গেছে।

একলা বাড়ীতে সামনের বারান্দায় এসে বসলাম। এখানে প্রকৃতি বড় মনোরম। লনের ধারে বেড়ে ওঠা শিউলীর ডালে অনেক কুঁড়ি, তলায় ঝরেও পড়েছে অনেক, আসছে শরৎ খবর পেলাম। আকাশ আরও ঘন মেঘে ছেয়ে গেল। এবার শুরু হল এখানকার রেওয়াজ মাফিক খুব বড় বড় ফোটার বৃষ্টি পড়া। বেশ কিছুদিন হয়ে গেল আমরা এই শহরে এসেছি তাই এখানকার প্রকৃতি কিছুটা হলেও চেনা হয়ে গেছে। আকাশে মেঘেরা এসেই তজন গর্জন শুরু করে দেয়, হেথা হেথা বিদ্যুতের চোখরাঙ্গানি আর বজ্র-নির্ঘোষ চলতে থাকে। আজও তার ব্যাতিক্রম হলনা। ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে পাণ্ডা দিয়ে বৃষ্টিরাও ছুটে চলেছে। হঠাতে ক্ষীণ আওয়াজ কানে এল, "দিদা আমি একটু ভেতরে আসব?" বাংলার গেটের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম, মনে হল একটো বাচ্চা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভালো করে নজর করতে মনে হল তার বুকের কাছে কী যেন কাপড়ে চাকা জিনিস আঁকড়ে ধরে আছে। বৃষ্টি এখন বেশ জোরেই পড়ছে। আমি তাড়াতাড়ি বললাম "আয় আয়, ভেতরে আয় একেবারে ভিজে গেলি যো!" গেট খুলে একটু কাছে আসতে বুঝতে পারলাম ও আদিবাসী পাড়ার মেয়ে মুঙ্গলী। ওর মায়ের সঙ্গে মাঝে আমাদের বাড়ীতে আসে কালোজাম, টোপাকুল এইসব বিক্রী করতে। বাঙালিদের মধ্যে বড় হয়ে উঠেছে বলে বাংলা ভাষায় বেশ অভ্যন্ত। আমি বললাম, "এখন

প্রায় সকে হয়ে আসছে আর এই ঝড়-জলের মধ্যে তুই বাড়ি যাসনি কেন?" ও আমাকে বুঝিয়ে বলল, "ঘরের পথেই তো জাতিছিলাম কিন্তু কুমিদের বাড়ীর বেংগাকে এই বিল্লি ছানাটা মিঁড়ি মিঁড়ি করি কাঁদিতিছিলো তাই।" কাপড়ের ঢাকাটা তুলে দেখাল ছোট্ট একটা সাদা ধৰণের বিড়াল ছানা। ও আমাকে অনেক অনুনয় বিনয় করল, ওদের যদি আমি আজকের রাতটুকু থাকতে দিই কারণ ওর মা জীবজন্তু সমেত কিছুতেই ওকে বাড়িতে ঢুকতে দেবে না। আমাদের বাড়ীর আউট হাউসে তখন কেউ ছিল না তাই নিতান্তই দয়াপরবস ওদেরকে থাকতে দিলাম। আমাদের কাজের মেয়েটির শুকনো জামা পায়ে দিয়ে মুঙ্গলী একটু ধাতস্ত হলে বিড়াল ছানাকে একটু চামচে করে দুধ খাইয়ে চাঙা করল। তার কিছুক্ষণ পরেই উদ্বান্তের মত তার মা এসে হাজির "মাগো আমার মুঙ্গলীর দেখেছো?" তাকে ভেতরে ভেকে এনে অনেক বুঝিয়ে শুনিয়ে রাজী করলাম যাতে মুঙ্গলী আমার কাছে থাকতে পারে। এই সব ঘটনার মাঝে বৃষ্টিও ধরে এসেছে, রাস্তার আলোগুলো জ্বলে উঠেছে।

এরপর মুঙ্গলী আমাদের বাড়িতেই থেকে গেল। তার ছানাটার নাম রেখেছে "বিল্লু মিয়া"। ভোর হলে মুঙ্গলী বাগান থেকে ঠাকুর পুজোর ফুল তুলে আনে, বাগানের গাছে জল দেয়, আর তার পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়ায় "বিল্লু মিয়া"। একটু বেলায় মুঙ্গলী তার আদিবাসী পাড়ার স্কুলে যায়, সঙ্গে নিয়ে যায় সাদা ধৰণের পুষ্যিটিক। আমি বাংলার বারান্দায় বসে দেখি সাদা বেড়াল ছানা আর তার কালো পালিকা মায়ের ছবিটি। বেলা এগারোটা নাগাদ স্কুল ছুটি হলে দুটিতে বাড়ী ফিরে আসে। তখন আমাদের কাজের মেয়ে সুধাও আসে। এইসময় বাড়ী একেবারে সরগরম, কত গল্প, কত খেলা, কত নাচানাচি, ঝগড়া, মারামারি। কাজ সারা হলে সুধা চলে যায়। আমারও স্নান খাওয়ার পাট চুকিয়ে ফেলি।

এই দুপুরবেলায় শান্ত শহর যেন আরো নিঝুম হয়ে যায়। মাঝেমাঝে এক একটা গাড়ী চলে যায় নিচের দিকে, আপিসের বাবুরা দুপুরের খাওয়া সেবে আবার কাজের

জায়গায় ফিরে যান। দূরে কোথাও নাম না জানা পাখি একটানা ডেকে চলে। অনেকবার পড়া একটা পুরোনো বই নিয়েই বারান্দায় বসি। এই সময় বিলু মিয়া তার প্রাত্যহিক প্রাচীর পরিক্রমায় বেরিয়ে যায়। এখন তার বেশ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ টের পাওয়া যায় আর পাড়ায় তার প্রতিপত্তিও ক্রমশ বাড়ছে। মুঙ্গলী আমার পাশে এসে দাঁড়াল “কটা আলপিন আর একটা পাতলা (সরু মুখ) কাঁচি দিবি দিদা?” আমি উঠে গিয়ে টেবিলের টানা থেকে জেগাড় করে আনলাম, ও এক দোড়ে ওর ঘরের দিকে চলে গেল। এই সময়টায় ও খুব ব্যস্ত থাকে ওর কাটুম-কুটুম নিয়ে। নানান জায়গা থেকে কাঠকুটা, কাঁচ-পুঁতি, পাথর, ঝিনুক, রঙিন কাগজ সব কুড়িয়ে কুড়িয়ে এনে কত রকমের খেলনা, গাড়ি বানায়। গরুর গাড়ি, হাতি, ঘোড়া, পুতুল, ইত্যাদি ছোট ছোট জিনিস তৈরী করে। মাঝেমাঝে আমাকে দেখাতে নিয়ে আসে, কোন কোনটা বেশ ভালো দেখতে লাগে। প্রতি বছর দুর্গা পুজোর আগে ওদের আদিবাসী পাড়ার রেল লাইন এর ধারে মেলা বসে সেখানে নিয়ে যায়। সেখানে দেশ বিদেশ থেকে নানা শুণীজনেরাও আসেন। ওর হাতের কাজও অনেকের পছন্দ হয়, বিক্রি হয়ে যায়। গতবার মেলাতে ওর তৈরী জিনিস ঐসব নামি শিল্পীরা পছন্দ করে নিয়ে গেছেন।



এবার পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠে আসা পাউরুটিয়ালার গাড়ির পাঁক পাঁক হৰ্ন শোনা যাচ্ছে, তার মানে সাড়ে চারটে বাজছে। বিলুমিয়ার মধ্যাহ্ন দ্রুমণ সমাপ্ত, তিনিও ঘরে ফিরলেন। বছরের এই সময় দিনের আলোও তাড়াতাড়ি করে আসে।

সঙ্গে হলেই মুঙ্গলী তার বই খাতা নিয়ে হাজির। পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে তার অসাধারণ

প্রশ্নবাণ - “টিয়াপাথির টেঁটটি লাল বটে কিন্তু ঠাকুরদাদার শুকনো গাল কেনে?” আমাকে আবার বোঝাতে হয় বয়স হলে মানুষের চেহারা শুকিয়ে যায়, ঠাকুরদাদা বুড়ো হয়েছেন তাই তাঁর শুকনো গাল। অন্যমনস্ক মুঙ্গলী হাঁ করে বিলুমিয়ার গা চাঁচা দেখছে আর আমি এককথা বারবার বলছি ও শুনছেন না। বিরক্ত হয়ে বলি “কিরে কানের মাথা খেয়েছিস নাকি?” বস আর যাই কোথা! “মাছের মাথা আছি, কানের মাথা হ্যানা, তুই একথা বললি কেনে?” আবার বোঝাই এসব কথার কথা, এর মানে হয় না।

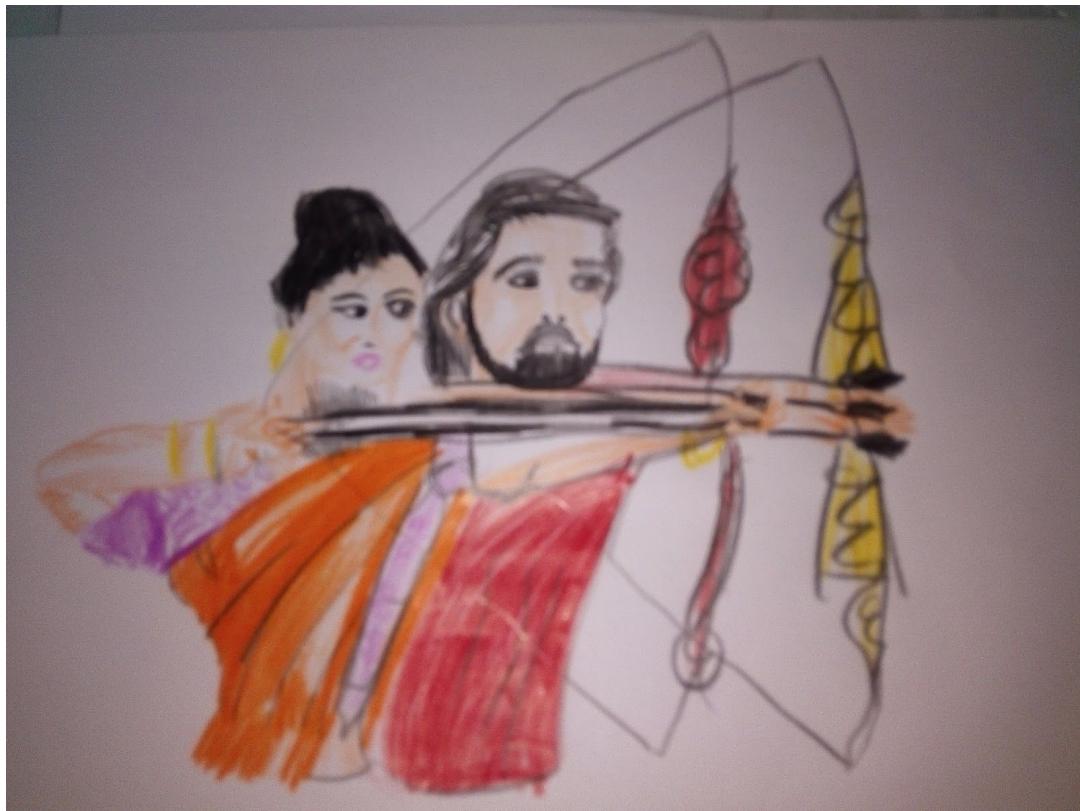
মুঙ্গলীর স্কুলের “বড় মাষ্টারবাবু” মানুষটি ভারি ভালো, মধ্যবয়স্ক বাঙালি ব্রাহ্মণ। তিনি চান এইসব ছোট ছোট আদিবাসী বাচ্চারা অন্তত প্রাথমিক শিক্ষাটুকু

পাক। প্রতি বছর দুর্গা পুজোর আগে যে মেলা বসে তাতে উনি উৎসাহ দিতে ওদের নিয়ে যান সেখানে ওর কত নতুন জিনিস, নতুন সাজের মানুষ দেখতে পায়। মেয়েটার ওপর ভারি মায়া পড়ে গেছে, কেমন যেন আদর কাড়া স্বভাব। বিলুমিয়াকে কিন্তু খুব শাসন করে, ওর রান্না ঘরে যাওয়া বারণ, সোফায় ওঠা বারণ। কিন্তু রান্নাঘর থেকে যখন মাছ ভাজার গন্ধ ভেসে আসে তখন বিলু তার চারটি পাকে আর নিজের বশে রাখতে পারে না। শুরু হয়ে যায় দুজনের শক্তির পরীক্ষা। আমি একদিন মুঙ্গলীকে বলেছিলাম “দেখ কোথায় এর ওর বাড়ী চুরি চামারি করে বেড়াবে তার থেকে ওকে ঠিকমতে খাবার দাবার দিস” আর দেওয়াও হয়। তবুও বিলুমিয়ার চরিত্রের সততা সম্বন্ধে আমার ঘোর সন্দেহ আছে। দুপুরবেলায় ও যখন পাড়া বেড়াতে বেরোয় তখন ওর চোখের চাহনি মোটেই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী সুলভ থাকে না।

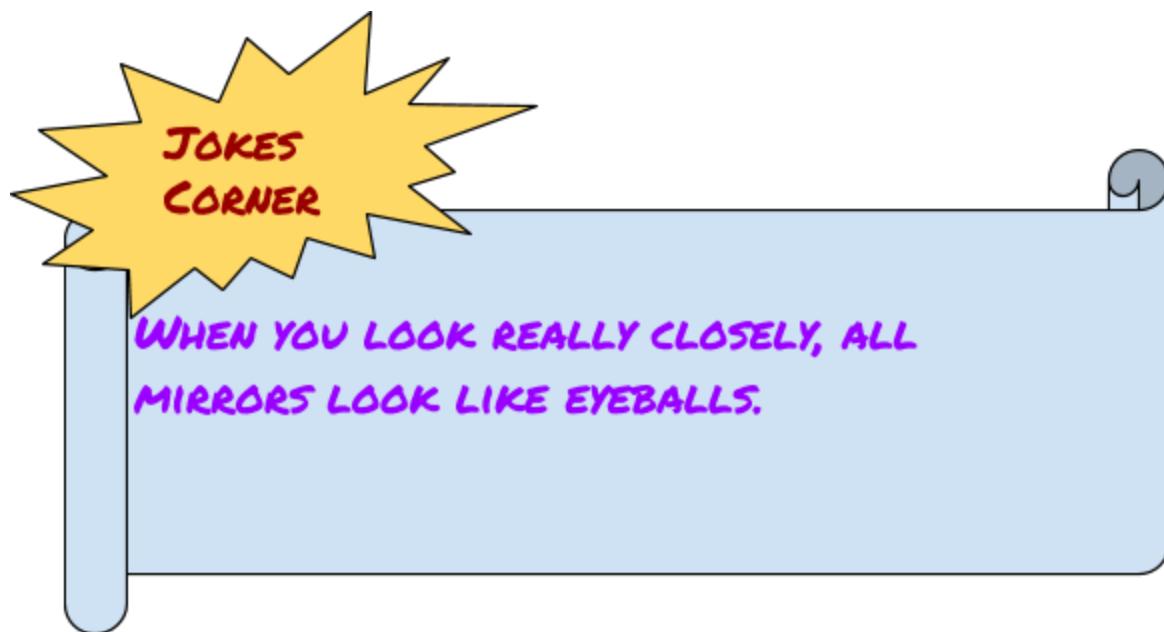
দুর্গা পুজো আবার এসে গেল, কাল থেকে মেলা বসবে। পরেরদিন সকল থেকে সাজ সাজ, যে ঘার তৈরী করা হাতি, ঘোড়া, গরুর গাড়ী ইত্যাদি বেতের ঝুঁড়িতে সাজিয়ে রওনা দিল। যতদিন মেলা চলবে ততদিন স্কুল বন্ধ কারণ বড় মাষ্টার বাবুই তো থাকবেননা। আকাশটাও বিকেল থেকে সাজ গোজ করে সন্ধ্যার মুখে বৃষ্টির নুপুর পায়ে মঞ্চে নেমে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই চারিদিক অঙ্ককার। বৃষ্টি একটু থামতেই মুঙ্গলী, তার মা, বিলুমিয়া সদলবলে বাড়ী ফিরল। তাদের মুখ শুনলাম বর্ষার কারণে আজ মেলা ভালো জমেনি। তবে একটা খুব বড় খবর হলো মুঙ্গলীর হাতের কাজ এক নামি শিল্পীর খুব পছন্দ হয়েছে তিনি নিজের খরচে তাঁর স্কুলে মুঙ্গলীকে নিয়ে যাবেন। দূরের কোন বড় শহরে তার স্কুল। বড় মাষ্টারবাবুও তাতে রাজী হয়েছেন। চলে যেতে হবে বলে মুঙ্গলীর চোখ বার বার জালে ভরে আসছে আর

তার মা তা কেঁদেই সারা। সামনের মঙ্গলবার মুঙ্গলী চল যাবে আর বিলুমিয়াকে আমাদের কাজের মেয়ে সুধার কাছে রেখে যাবে। ও চল যাবে বলে দুঃখ হলও আদিবাসী মেয়েটার জীবনে নতুন আলো জ্বলবে ভেবে খুব আনন্দ হল। এই ব্যবস্থার ভালো দিকটা ওই অল্প জানা মা-মেয়েকে বুঝিয়ে বললাম, বিলুমিয়াও বেশ গুরুগত্তির ভাবে আমাদের আলোচনায় অংশ নিল।

একদিন মুঙ্গলীকে প্রশ্ন করি “হ্যাঁরে তোর নাম মুঙ্গলী কেন রে?” ও বলেছিল “ঈ যে বুড়ো দাদুটা বলল মঙ্গলবারে জন্ম নিল ওরে মুঙ্গলী বলে ডাকিস।” এই ছোট সীমানা ছাড়িয়ে ওর নতুন জন্ম হবে সেই মঙ্গলবারেই।



Bahubali and Devsena - Srinika Roy (Age 6)





MCET: মুর্শিদাবাদ কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড ঠ্যাঙ্গানি

অভিষেক ব্যানার্জী

॥ আগমন ॥

ডান দিকের উইং এর শেষ ঘর। খুব বেশি হলে আট হাত চওড়া আর হাত দশকে লম্বা হবে। তাতে ঠাসা ঠাসি করে চারটে মড়ার খাটোর মত দেখতে চোকি পাতা, তাদের একটির উপরে তোষক বিছানা আর বাকিগুলো তখনো থালি। আর আসবাব বলতে ঘরের এক কোনায় ছোট একটা টেবিল, যেটা তার জীবনের শেষ বেলায় এসে কোনোমতে চার পায়ে দাঁড়িয়ে যেন মুক্তির অপেক্ষা করছে। জানলার পাশের একটা চোকিতে আমার জিনিসপত্র নামিয়ে রেখে বাবা আর আমি বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। দোতলা বাড়িটা ইংরেজির 'ইউ' আকৃতির। পর পর সব ঘর আর সামনে টালা বারান্দা। দেখে মনে হয় আগে এটা কোনো স্কুল বাড়ি ছিল যাকে পরিবর্তী কালে এই হোস্টেলের ক্লপ দেওয়া হয়েছে। সমস্ত ঘরেই তখন নতুন ছাত্রদের ব্যাস্ততা।

হোস্টেলটা ঘুরে দেখতে বেরিয়ে দোতলার কমন বাথরুমে একবার পা রেখে বেশ আতঙ্কিত হয়েই সিঁড়ি ভেঙে নিচে এলাম একতলাটা জরিপ করতে। একতলায় সিঁড়ির নিচে জড়ো করা প্রচুর রান্নার কাঠ, তবে এই কাঠের যে রান্না ছাড়াও অন্য উপযোগিতা আছে তা পরে টের পেয়েছিলাম। সিঁড়ি পেরিয়ে বেশ বড় রান্না ঘর, যার তেল কালি মাথা চার দেওয়াল বহু বছরের রান্না-ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রান্না ঘরের সঙ্গে লাগেয়া খাওয়ার ঘর, যেখানে মফস্বলের স্কুলের ধাঁচে পর পর লম্বা বেঞ্চি পাতা ডাইনিং টেবিল হিসাবে ব্যবহারের জন্য। নিচের তলায় এছাড়াও হোস্টেল সুপারের অফিস, দারোয়ানের ঘর, আর কিছু স্টোরেজ বাদ দিলে বাকি ঘরগুলো তালা বক্স, যার খেকে বোঝা গেল ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা সব উপরের তলায়। বিস্তৃত এর সামনে একটা বড় খেলার মাঠ আর সেটা পেরোলেই মেইন রোড যার অপর দিকে আধ মাইল খালেক এগোলে কলেজ এর ক্যাম্পাস। এই হল মুর্শিদাবাদ ইঞ্জিনিয়ারিং

কলেজের প্রথম বর্ষের হোস্টেল; অন্যান্য বছরের হোস্টেলগুলো মেইন ক্যাম্পাসের অন্তর্ভুক্ত।

সবকিছু ঘুরে দেখে বেশ দমেই গেলাম। এর আগে কখনো হোস্টেল বা মেস বাড়িতে থাকার সৌভাগ্য হয়নি, তাই তাদের স্বাক্ষ সম্পর্কে বিভিন্ন নেতৃত্বাচক কথা শুনে থাকলেও চাস্ফুস করা এই প্রথম। যাই হোক, বাবাকে বারাসাত এর দিকে রওনা করে দিয়ে ঘরে ফিরে দেখলাম ততক্ষণে দুই ক্লম্বমেটার আবির্ভাব ঘটেছে। প্রথম জন বর্ধমান এর বাসিন্দা। মুখে একরাশ বিরক্তি নিয়ে প্রথম আলাপেই বোঝালো যে হোস্টেল তার মোটেই পছন্দ হয়নি এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অন্য কোথাও বাড়ি ভাড়া নিয়ে পালাতে পারলে সে বাঁচে। দ্বিতীয় জন অবশ্য দমদমের বাসিন্দা জানতে পেরে আমি অযথাই একটু বেশি উৎফুল্প হয়ে উঠেছিলাম, তিনি দেশে নিকট আস্থায় থুঁজে পাওয়ার মত। হোস্টেল তারও অপছন্দ কিন্তু 'ম্যানেজ' হয়ে যাবে, ইত্যাদি বলে সে আমাদের চাঙ্গা করার চেষ্টা করতে থাকল এবং তাতে বোধহয় কাজও হল কিছুটা। চতুর্থ মূর্তির অনুপস্থিতির সুযোগ তুলে ঘরের কোন দিকে কে কেটা দখল নেব তাই আলোচনা করতে করতে বেশ আড়াই জমে গেছিলো। রাশ কাটলো 'ঃঃঃঃঃ' ঘন্টার শব্দে। তিনি জনেই একটু অবাক, যেন স্কুল ক্লাস শেষের ঘন্টা। পরমুহূর্তেই বারান্দায় সবাইকে থালা বাটি হাতে নিচে নামতে দেখে বুুলাম ওটা ডিলার এর ঘন্টা।

একটি কালচে হলদে জলের মত ডাল, কদাকার আলুভাতে আর ডিমের ভগ্নাবশেষ ভাসমান ঝোল হল প্রথম রাতের ডিলার। তবে এরা অখাদ হলেও এদের সবাইকে টেক্ষা দিলেন স্বয়ং ভাত। খাওয়া তো দূরে থাক, পশ্চিমবঙ্গে যে এরকম মোটা, লালচে, শক্ত ভাত করার মত চাল পাওয়া যায়, তা জানাই ছিল না। এই বিজাতীয় খাদ্য বস্তুদের কিভাবে সন্তুষ্টি করা যায় তা নিয়ে আমরা যখন আলোচনায় ব্যাস্ত তখন উদয় হলেন হোস্টেল সুপার। আর পাঁচটা সাধারণ রাজনৈতিক

বক্তৃতা জাতীয় ভাষণ দিয়ে কলেজ আৰ হোস্টেলেৰ মাহাব্ব প্ৰচাৰ কৰে তিনি একটি সতৰ্ক বাৰ্তা জাৰি কৰলেন। বক্তৃবা এই, যে আমৱা যেন নাতে দৱজা ভালো কৰে বন্ধ কৰে ঘুমাই, বাইৱেৰ কেউ ডাকলৈ যেন নিচে না নামি আৰ বিকেলেৰ পৱ কোথাও যাওয়াৰ দৱকাৰ পড়লে একা না গিয়ে দল বেঁধে বেৱোলোই ভালো, ইত্যাদি। এবং এটিই ছিল সমস্যাৰ পূৰ্বাভাস।

॥ উত্তম-মধ্যম ॥

থবৱ যেমন হাওয়ায় ভাসে তেমনি পৱদিন সকালে আমৱা যথন ক্লাসেৰ জন্য রেডি হচ্ছি তখনি হোস্টেলে রাটে গেল যে সিনিয়ৱৱা সব তৈৱী আছে নতুন ছাত্ৰদেৱ অভ্যৱ্যন্তা কৰাব জন্য। তাৰ সঙ্গে গত বছৱ নতুনদেৱ কিভাবে আপ্যায়ন কৰা হয়েছিল তাৰ কিছু গল্প এবং সেই প্ৰতিশোধ নেওয়াৰ জন্য বৰ্তমান বিত্তীয় বৰ্ষেৰ ছাত্ৰৱ কতটা মুখ্যমে আছে তাৰ পূৰ্বাভাসও পাওয়া গেল। অতএব কপালে কি আছে তা খনিকটা আন্দজ কৰেই আমৱা মেটামুটি দল বেঁধে কলেজে চুকলাম। ক্লাসে পৌছালোৰ আগেই একদল পোড় থাওয়া ছেলে আমাদেৱ কোন ডিপার্টমেন্ট, কোথা থেকে এসেছি এসব জিজ্ঞাসা কৰে গৃহপে ভাগ কৰে দিয়ে কোন ঘৱে গিয়ে বসতে হবে জানিয়ে দিল। এও বলা হল যে প্ৰথম দিন ক্লাস কিছুই হবে না, পুৱেটাই 'ওৱিয়েন্টেশন' এৱ উপৱ দিয়ে যাবে। পৱে জেনেছিলাম, নতুন ছাত্ৰদেৱ এই ভাগাভাগিতে সাধাৱণত সিনিয়ৱৱা নিজেৱা বহৱমপূৰেৰ বাসিন্দা না হলে সেখানকাৰ জুনিয়ৱৱদেৱ না ঘাঁটিয়ে বৱং অন্যত্ব থেকে আসা ছাত্ৰদেৱ ওৱিয়েন্ট কৰতেই বেশী পছন্দ কৰে; অভীতেৰ নানা অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এই ব্যবস্থা।

যাই হোক, আমৱা সুবোধ বালকদেৱ মত নিদিষ্ট ঘৱে গিয়ে বসাৰ পৱ কিছু সিনিয়ৱ এসে দৱজা ভিতৰ থেকে বন্ধ কৰে দিয়ে ভীষণ হংস্তিষ্পি শুকু কৰল। কলেজে সিনিয়ৱৱাৰাই সৰ্বেসৰ্বা, তাৰেৰ সম্মান দেখাতে হবে, যা বলবে তাই কৰতে হবে এবং বেচাল দেখলে মেৰে পাট কৰে দিলে কেউ বাঁচাতে আসবে না ইত্যাদি বলে আমাদেৱ ইঞ্জিনিয়াৱিং পড়াৰ ব্যাপাৰে ভীষণ উদ্বৃক্ত কৰতে শুকু কৰল। অছুত এক বিধান দেওয়া হল, যে আমাদেৱ কোমৰে বেল্ট পৱা চলবে না, জামা সবসময় গুঁজে পৱতে হবে আৱ হাঁটাৰ সময় মাথা নিচু কৰে চলতে হবে, ভুল কৰলেই ঠাণ্ডানি। প্ৰত্যাশা মতই এৱ পৱ আমাদেৱ সবাইকে কথনো বিভিন্ন ভাষায় গান গেয়ে, নটৱাজেৰ মত বৃত্ত প্ৰদশনী কৰে, ভিন্ন জন্তু জানোয়াৰ এৱ মত আওয়াজ কৰে বা কথনো সৱীস্পেৱ মত মেঝে দিয়ে চলে ফিৰে বেড়িয়ে তাৰেৰ মনোৱশন কৰে যেতে হল। এৱ মাঝে অৰশ্য কিল, চড়, লাথি চলতে থাকল ওৱিয়েন্টেশন এৱ অঙ্গ হিসাবে আমাদেৱ ভুল ব্ৰাণ্টি শুধৱে দেওয়াৰ জন্য। এখানে দুৰ্ভাগ্য বসত আমাদেৱ মধ্যে এক অতি গোবেচোৱা ছেলে ছিল, যাৱ বাবা মা ভবিষ্যতেৰ এই বিপদ আঁচ কৰতে না পৱে তাৰ নাম রেখেছিল 'প্ৰোটন'। তাই সে কেন প্ৰোটন হয়ে এটম এৱ কেন্দ্ৰ বিন্দুতে থাকতে চায় এবং ইলেক্ট্ৰনৱা কি দেষ কৰেছে যে তাৰেৰ প্ৰোটনেৰ চাৰদিকে ঘুৱতে হবে এসব গুৱৰুপূৰ্ণ প্ৰশ্নেৰ সঠিক জবাব দিতে না পাৱায় তাৰ কপালে মাৱ জুটলো একটু

বেশিই; আৱ তাতে ভয় পেয়েই হোক বা আঞ্চলিকাতেই হোক, সে হটাৎ, "মাথা ঘুৱছে, সব অন্ধকাৰ দেখছি" ইত্যাদি ঘোষণা কৰে নিকটবৰ্তী ডেক্সেৰ উপৱ মুৰ্ছা যাওয়াই শ্ৰে মনে কৰল। বলাই বাহল্য এতে আমাদেৱ সবাৱই বিশেষ সুবিধা হল; প্ৰোটনকে পুনৱায় সন্তুষ্য কৰতে ব্যস্ত হওয়ায় ওৱিয়েন্টেশন তথনকাৰ মত বন্ধ হল। এবং এৱইমধ্যে কোনো ভাবে এই বাড়াবাড়িৰ থবৱ ছড়িয়ে পড়ায় কিছু প্ৰফেসৱ এসে সিনিয়ৱৱদেৱ প্ৰচন্ড ধৰ্মক আমাদেৱ অফিস ঘৱে নিয়ে গেলেন। সেখানে আমাদেৱ কিছু শান্তনা বালী শুনিয়ে অভয় দেওয়া হল যে ভবিষ্যতে এই সিনিয়ৱৱদেৱ সঙ্গেই আমাদেৱ প্ৰগাঢ় বন্ধুষ্ট তৈৱী হয়ে যাবে, আৱ এখন যা ঘটছে তা কালোৱ নিয়মে সব কলেজেই হয়ে এসেছে তাই এনিয়ে বিশেষ চিন্তাৱ কোনো কাৱণ নেই। যাৱ সারমৰ্ম একটাই, যেমন চলছে তেমনি চলবে, আমাদেৱই মানিয়ে নিতে হবে।

সেদিন সন্ধিয় হোস্টেলেৰ ঘৱে ফিৰে তিনজন বসে কাৰ সঙ্গে কি হয়েছে এই নিয়ে কথা চলছে এৱ মধ্যে ঘৱে চুকলো একটি রোগা পাতলা চেহৱার ছেলে; দুই হাতে দুটো বড় ব্যাগ, জামাটা একদিকে ছেঁড়া আৱ ঠোঁটেৱ কোনে সদ্য মাৱেৰ চিহ্ন। আমৱা মুখ চাওয়াচাওয়ি কৰাছি দেখ সেই বলল, "আৱে আমিও এই ঘৱে, আসতে একদিন দেৱি হয়ে গেল"। বুৰলাম ইনিই আমাদেৱ চতুৰ্থ মূৰ্তি। তাৰ থেকেই জানা গেল হোস্টেলেৰ মাৰ্টেৱ ধাৱেৰ মাচায় একদল সিনিয়ৱ ছাত্ৰ বসে নেশা ভাঙ কৰেছিল, সেদিক দিয়ে আসাৱ সময় নতুন ছাত্ৰ বলে চিনতে পেৱে তাৰ উপৱ চডাও হয় ওৱা। কিন্তু সিনিয়ৱ হওয়া সঙ্গেও ওদেৱ সেৱম সমীৰ না কৰে চলে আসাৱ চেষ্টা কৰতেই তাৰ উপৱ বেশ কয়েক ঘা বাসিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু মজাৱ ব্যাপাৱ হল এসবে সে একটুও দমে না গিয়ে জানাল, এই কলেজে এইসব হয় তা তাৰ জানাই ছিল এবং শুনৱ দিকে সামলে চলে এসব হজম কৰে নিলে পৱে তাৱও সুযোগ আসবে হিসেবে বুঝে নেওয়াৱ, সে থবৱও সে নিয়েই এসেছে।

ছেলেটি মুৰ্শিদাবাদেৱ বাসিন্দা, তাই তাৰ থেকে কলেজেৰ ব্যাপাৱে অনেক থবৱই পাওয়া গেল। যেমন এখানে পড়াশুনা বিশেষ হয় না, ছাত্ৰৱ অন্তৰ বৰ্ষীয় দাঙ্গা হাঙ্গামা নিয়েই বেশ ব্যস্ত, আৱ তাৰ সঙ্গে আছে এক অতি প্ৰভাৱশালী রাজনৈতিক দলেৱ আক্ষলন, যাৱ ফলে ইঞ্জিনিয়াৱিং এৱ থেকে পলিটিকাল সাময়িকী জ্ঞান অৰ্জন হওয়াৱ সম্ভবনা বেশি আগামী চাৱ বছৱে। আৱ পাশ কৰাব পৱেও এখান থেকে চাকৰিৱ কোনো আশা না রাখাই ভালো তাও সে জানিয়ে দিল। অতএব আমাদেৱ বুৰাতে বাকি রাইল না যে এখানে ভবিষৎ অন্ধকাৱ।

এৱ পৱেৱ সম্ভাব দুই আমাদেৱ অনেকেৱ জীবনেৱই একটা বিভীষিকাময় অধ্যায়। পড়াশুনাৱ চেষ্টা সম্পূৰ্ণ ত্যাগ কৰে তথন শুধু টিকে থাকাৱ লড়াই এবং আশা এই যে পৱিস্থিতি কিছুটা হলেও বদলাবে। কিন্তু প্ৰতিদিন যেন তাৰ অৰ্বনতিই হতে থাকল। কলেজে ragging এৱ ভয়ে কিছু ছেলে হোস্টেল থেকে বেৱোলো বন্ধ কৰে দিল। কিন্তু সে থবৱও মাৱমুৰী সিনিয়ৱৱদেৱ কাছে গোপন থাকল না। একদিন যথন আমৱা বাকিৱা কলেজে ব্যস্ত, সেই সময় হোস্টেলে একদল সিনিয়ৱৱেৰ আবিৰ্ভাৱ ঘটে এবং যে কজন ছাত্ৰ ভয়ে নিজেদেৱ ঘৱ-বন্দী

করেছিল, তাদের ওই সিঁড়ির নিচে জমা করা রান্নার কাঠ দিয়ে উত্তম মধ্যম দিয়ে তারা ফিরে যায়।

॥ প্রায়ন ॥

তখন কারোর কাছেই মোবাইল ফোন ছিল না। হোস্টেলের একটামাত্র ল্যান্ডলাইন ব্যবহার করে সবাই বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করত, কিন্তু সেটা বেশিরভাগ সময় হয় ব্যাস্ত নয়তো অচল থাকত, তাই বাড়ির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করা বা এদিকে কি ঘটেছে তা জানানোর বিশেষ অবকাশ হয়নি। তাছাড়াও অবস্থার বর্ণনা দিয়ে বাড়ির লোককে কেউই বিবরণ করতে চাইনি। তাই এসব পরিস্থিতি সামান্য দেওয়ার পরিকল্পনা আমাদের নিজেদেরই ভেবে বার করতে হচ্ছিল।

রান্নার কাঠের অপব্যবহারের ঘটনাটি ঘটার পর হোস্টেল এর সব ছাত্র মিলে হোস্টেল সুপার, ডিন এবং আরো কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কাছে অভিযোগ জানালাম যে যদি এভাবেই চলতে থাকে তাহলে আমরা কলেজ বা হোস্টেল ছেড়ে দিতে বাধ্য হব এবং খরচ বাবদ যা টাকা জমা আছে তা সব ক্ষেত্রে নিয়েই যাব। এতে এক নতুন সমস্যার উদয় হল। কলেজ আর হোস্টেলের ভিতর অবস্থা কিছুটা শান্ত হলেও সিনিয়ররা আমাদের জন্য হোস্টেলের বাইরে মাঠের ধারে, পাড়ার মাচায়, গলির মুখে, বাজারে ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় ৩০ পেতে থাকতে আরম্ভ করল। ক্যাম্পাসের বাইরে কাউকে দুঃখ দিলে তাতে কঢ়পক্ষের কোনো দায় থাকে না সে হিসাব করেই এই ব্যবস্থা। থালা পুলিশ করার চেষ্টা করেও যে কোনো লাভ হবে না সে খবর আমরা ততক্ষণে পেয়েছি।

এতো কাওয়ের পরে আমাদের চার জনের তিন জন ততক্ষণে সম্পূর্ণ হাল ছেড়ে দিয়েছি। মুর্শিদাবাদী যদিও অটল, পাল্টা না মেরে তিনি শান্ত হবেন না। অগত্যা এখান থেকে কি করে পালানো যায় তার উপায় ভাবতে বসলাম। সোজা রাস্তায় দিলেরবেলা ব্যাগ নিয়ে বাস ধরে পালাতে গিয়ে দু তিন জনের কপালে ততক্ষণে বেশ ভোগায়ি জুটেছে তা জানতাম, তাই অন্য রাস্তা ভাবতে হবে। ঠিক হল আগে বাড়িতে ফোন করে জানালো হবে আমরা দুলিনের ছুটিতে বাড়ি আসছি, যাতে ঠিক সময় বাড়ি না পৌঁছালে বাড়ির লোক হোস্টেল থবর নেয়। বাস না ধরে প্রায় মাইল দূরেক দূরের স্টেশন থেকে ট্রেন ধরব ঠিক করা হল। বাস রাস্তার দিকে নজর রাখলেও অতদূরে ট্রেন স্টেশন অবধি যে আপদ পৌঁছাবে না তা আমরা আন্দাজ

করেছিলাম। কিন্তু নজর এতিয়ে স্টেশন অবধি পৌঁছানো সহজ হবে না।

হোস্টেলে বাজার দিতে আসতো একটা অল্প বয়েসী ছেলে, পাংকু, পাশেরই একটা গ্রামে থাকত। তার সঙ্গে এতদিনে আমাদের বেশ বন্ধুস্বী হয়ে গেছিল। আমাদের অবস্থা দেখে সে এতদিন বেশ অভয় দিয়েই এসেছে এবং খুব দরকার লাগলে তাকে যেন খবর দিই তাও জানিয়ে রেখেছিল। এবার সুযোগ বুঝে তাকেই জানালাম আমাদের পিঠ-টান দেওয়ার পরিকল্পনা। তার থেকে আশা একটাই, আমাদের কোনও ভাবে যেন স্টেশন অবধি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। সব শুনে পাংকু একটুও বিচলিত না হয়ে বলল, "আমি তো জানতাম তোমরা এখানে টিকতে পারবে না, এ তোমাদের জন্য নয়। প্রতি বছরই ছেলেপুলেরা পালায়। কিছু ফিরে আসে, কিছু আর এমুখ্যে হয় না। কিছু ভেবো না, সব ব্যবস্থা করছি।"

আমরা যেন আশার আলো দেখতে পেলাম। পাংকুর সঙ্গে বসে ঠিক করা হল আমরা দুদিন পরের ভোর ছটার লালগোলা প্যাসেজার ধরবো মুর্শিদাবাদ স্টেশন থেকে। তাকে কিছু টাকা দিয়ে দেওয়া হল যাতে সে আগের দিন আমাদের তিন জনের টিকেট কিনে আনতে পারে। তার এক আঙুলীয় পেশায় ভ্যান রিক্সা চালক; পরিকল্পনা মত ভোর চারটে নাগাদ হোস্টেলের পিছন দিকে তিনিই এলেন আমাদের নিতে। প্রত্যেকেই প্রায় সব কিছু ফেলে রেখে ছোটো একটা ব্যাগে যা কিছু খুবই দরকারি তা নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে চম্পট দিলাম।

একঘন্টার বেশী সময় লেগেছিল সেদিন অলি গলি দিয়ে ভ্যান রিক্সায় চেপে স্টেশন পৌঁছাতে। গোটা রাস্তায় আতঙ্কের সঙ্গে সামনে পিছনে নজর রেখে বসেছিলাম আমরা, পাছে ওরা ধরে ফেলে। প্রায় দশ ঘন্টা পরে দমদমে নেমে যেন বন্দি দশা থেকে মুক্তির আনন্দ পেলাম, প্রতিষ্ঠা করেছিলাম আর কোনোদিন ওই কলেজ মুখে হব না, তাতে এ জন্মে কোথাও ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া না হলেও চলবে। আমাদের তিনজনের মধ্যে দুজন আর সত্ত্বিই কখনও ফিরিনি ওখানে। বর্ধমানবাসী ফিরেছিলেন সে খবর যদিও পেয়েছিলাম, কিন্তু তারপর আর কখনো তার সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে ওঠেনি। বাবা অবশ্য পরে একবার ফিরে গিয়ে আমার বাকি জিনিসপত্র আর ভর্তির টাকা উদ্ধার করে এবং হোস্টেল সুপারের উপর বেজায় চোটপাট করে বাড়ি ফিরেছিল। আমার স্বল্প মেয়াদী মুর্শিদাবাদী ইঞ্জীনিয়ারিংয়ের সেখানেই ইতি।



ଦୂରତ୍ତ ପ୍ରେମ

ମଞ୍ଜନୀ ରାୟ



ବୋଧାର ବୟମ ହ୍ୟନି ତଥନୀ ନେହତେଇ ଛେଲେମାନୁସ୍ତାନୀ ପାଢାର ମଧ୍ୟେ ବିକେଳବେଳୀ ହଟୋପାଟି - ଚୋରଚୋର, କୁମିରଡାଙ୍ଗୀ, ଛେଁଁୟାଛୁୟି, ଆରଓ କତକି। ସବାର ମାବେ ତୁମି ଛିଲେ ଆମାର ସବଚେଯେ ପଛନ୍ଦେର, ଆମାର ଥିକେ କ୍ଯାକେ ବଚରର ବଡ଼ୋ ଆମାର ପ୍ରିୟ 'ଅୟନଦା'। ମା ଓ ସେଟୋ ବୁଝାନ୍ତି। ଏକଦିନ ଖେଲତେ ନା ଆସିଲେ ମା ଓ ସେଦିନ ଜିଙ୍ଗସା କରନ୍ତ, "କିରେ ଆଜ ଅୟନ ବାବୁର କି ହଲ?" ଏହିଭାବେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ କଥନ ଯେ ବଡ଼ୋ ହ୍ୟେ ଗେଲାମ ବୁଝାନ୍ତେଓ ପାରିଲି ଆର ତୁମି ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟାରିଙ୍ ପଡ଼ିତ ହେସ୍ଟେଲେ ଚଲେ ଗେଲେ। ଯଥନ ଛୁଟିତେ ଆସନ୍ତେ ତଥନ ଡାକତେ," କିରେ ରିନି, ତୋର କି ଥିବାର? ବଡ଼ୋ ହ୍ୟେ ଗେଲି ତୋ!" ଆମି ମନେ ମନେ ବଲତାମ, "ଆହ, ଆମିହି ଯେଣ ଶୁଦ୍ଧ ବଡ଼ୋ ହ୍ୟେଛି, ତୁମି ହ୍ୟାନି ବୁଝି?" ମାବେ ମାବେ ମଜା କରେ ବଲତେ, "ସେଇ ପେଣ୍ଟିର ମତଇ ରଯେ ଗେଲି? ସାଦା ପେଣ୍ଟି, ସାଜନ୍ତେଓ ଶିଖିଲି ନା।" ଆମି ବଲତାମ, "କେନ ଗୋ ତୋମାଦେର କଲେଜେର ମେଯେ ବନ୍ଧୁରା ଥୁବ ସାଜୁଗ୍ଜୁ କରେ ବୁଝି? ମନ ପଡ଼େଛେ ତାଦେର ଉପରେ ତାଇଲା?" ରେଗେ ଗିଯେ ବଲତେ, "ଥୁବ ପାକା ହ୍ୟେଛିସ୍।" ଆମି ବଲତାମ, "ଆମି ତୋ ପେଣ୍ଟି ତାଇ ଆମାର ଦିକେ ଆର ତୋ ତୁମି ତାକାବେନା, ତାଇ ବନ୍ଦୁମୁଁ।" ଏହିରକମ ଖୁଲୁସୁଟି ଲେଗେଇ ଥାକତ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବନ୍ଧୁରେ ସୀମାନା ଛାଡ଼ିଯେ ପ୍ରେମ ଯେ କଥନ ମନେର ଅତଳେ ବାସା ବେଂଧେ ବୁଝାନ୍ତେଓ ପାରିଲି। ଯଥନ ବୁଝାନ୍ତାମ ତଥନ ଅୟନଦା ଚାକରି ନିଯେ ବିଦେଶେ ପାଢ଼ି ଦିଯେଛେ। ଏଦିକେ ଆମିଓ ଏମ ଏ ପାଶ କରେ ଏକଟା ଷ୍ଟୁଲେ ଚାକରି କରି।

ବାଢ଼ି ଥିକେ ବିଯେର ତୋଡ଼ଜୋଡ଼ ଶୁରୁ କରେ ଦିଯେଛେ। ଭାବଲାମ, ତୋମାକେ ଆର ବଲା ହଲ ନା ଅୟନଦା, ଆମାର ଭାଲୋବାସା ଅବ୍ୟକ୍ତିଇ ଥିକେ ଗେଲା। ଆର ତୁମି ଓ କି ଏହି ପେଣ୍ଟିକେ ଆର ମନେ ରେଖେଛ? ଏଥନ ବୋଧହ୍ୟ ତୋମାର ମନେ କତ ରଙ୍ଗିନ ସ୍ପଲ୍ଲା।

ଆମାର ବିଯେ ପ୍ରାୟ ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ ପାକା କଥା ହ୍ୟେ ଗେଛେ କିନ୍ତୁ ବିଯେର ଦିନଟା ଏଥନୀ ଠିକ୍ ହ୍ୟନି। ହଠାତ୍ ସକାଳବେଳୀ ଅୟନଦା ଆମାଦେର ବାଢ଼ିତେ ଏମେ ହାଜିର। ଆମି ତୋ ଭୂତ ଦେଖାର ମତୋ ଚମକେ ଉଠେଛି । କି ବ୍ୟାପାର ସାତମୟମୁଁ ପେରିଯେ କବେ ଏଲେ? ଅୟନଦା ବଲଲ, "ମାନେଟା କି? ତୋକେ ସବ ବଲତେ ହବେ ନାକି? ଏମେହି ବ୍ୟାପ ଆବାର କି । ଏବାର ତୁଇ ଆମାର ମଙ୍ଗେ ଯାବି।" ଆମି ଆଶର୍ଯ୍ୟ ହ୍ୟେ ବଲଲାମ, "କୋଥାଯା?" ଅୟନଦା ବଲଲ, "କେନ, ସାତମୟମୁଁ ପାରା।" ଆମି ବଲଲାମ, "ମେ ଆବାର ହ୍ୟ ନାକି?" ଶୁଦ୍ଧ ବଲଲ, "ହ୍ୟ ହ୍ୟ।" ଛୁଟେ ଚଲେ ଗେଲ ଆମାର ମା ବାବାର କାହେ। ଗିଯେ ବଲଲ, "କାକୁ, କାକିମା ତୋମାଦେର କାହେ ଆମାର ଏକଟା ଚାଓୟାର ଆଛେ। ଆମି ରିନିକେ ଏବାର ଆମାର ମଙ୍ଗେ ନିଯେ ଯାବା।" ବାବା ମା ତୋ ଅବାକ ! ସେକି! କି କରେ? ଅୟନଦା ବଲଲ, "ଯେମନ କରେ ନିଲେ ତୋମରା ଥୁଶି ହବେ, ତେମନ କରେ।" ବାବା ମା ବଲଲ, "ଏ କି ବଲଚ ଅୟନ?" ଅୟନଦା ବଲଲ, "ଏ ପେଣ୍ଟିକେ ଛାଡ଼ା ଆମାର ଯେ ଚଲବେନା କାକିମା।"

ଏରପର ଶୁଭମ୍ୟ ଶିଘ୍ରମ, ଧୂମଧାମ କରେ ବିଯେ ହ୍ୟେ ଗେଲ ତାର ମଙ୍ଗେ ଅୟନେର। ତାରପର ଆର କି, ସାତମୟମୁଁ ପେରିଯେ ନତୁନ ସଂସାର, ନତୁନ ଭାଲୋବାସା, କତ ଥୁଶି କତ ଆନନ୍ଦ ସବ ସବ ମନେ ପଡ଼ୁଛେ ଆଜ ରିନିର। ସୁଧେର ମାଗରେ ଭାସତେ ଭାସତେ କଥନ ଯେ ଚାଲିଶଟା ବଚର ପେରିଯେ ଗେଛେ ରିନିର ଜୀବନେ ଟେର ଓ ପାଯ ନି ମେ। ତାର ସ୍ବପ୍ନେର ଭାଲୋବାସା ସାଥିକ ହ୍ୟେଛେ ଆଜ। ତାର ଆର ଅୟନେର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ପୁରୁଷୀ, ମାନୁଷେର ମତୋ ମାନୁସ ହ୍ୟେଛେ। ବିଯେ ଓ ହ୍ୟେ ଗେଛେ ତାର। ତାଦେର ଓ ଏକଟି ମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ସାଯନ, ଡାକ ନାମ ତୋଜେ, ରିନିର ନୟନେର ମନି। ମେଓ ଦିଦା ଛାଡ଼ା କିଛୁଳେ ବୋନେନା। ଫୁଲେ ଫୁଲେ ଭରେ ଉଠେଛେ ଆଜ ତାର ସଂସାର। ରିନିର ଅସୀମ କୃତ୍ତବ୍ୟ ଈସ୍ତରେର ଉପର ତିନି ନା ଚାଇତେଇ ଅନେକ ଅନେକ ଦିଯେଛେନ ତାକେ। ଦୁହାତ ଭରେ ଦିଯେଛେନ।

কিন্তু তবুও এত সুখের মধ্যেও একটু দুঃখ রিনির মনকে বড়ে অশান্ত করে তুলেছে। না তার জন্য সৈশ্বরের কাছে কোনো অভিযোগ নেই তার।

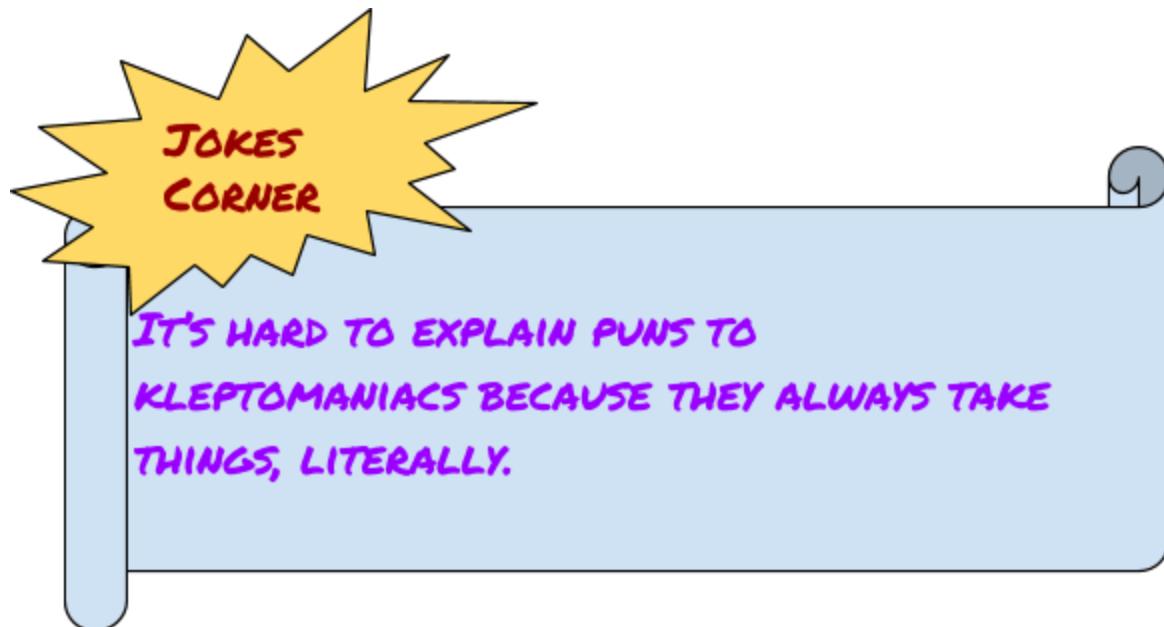
দেশে কেউ নেই। মা বাবা গত হয়েছেন। যে কয়েকজন আস্থায়মজন আছে তাদের সঙ্গেও সেরকম যোগাযোগ নেই। তবুও দেশের প্রতি কি অমোগ টান। মৃত্যুর আগে জন্মভূমির কোলে মাথা রাখতে চায় রিনি। আর তার শেষ ইচ্ছাপূরণ করার জন্য অয়ন বন্ধ পরিকর। বুক ফাটে তো মুখ ফোটেনা তার। এর নামই বোধহয় ভালোবাসা।

বারান্দায়ে বসে বসে এতক্ষণ সুখসূচি রোমশ্বন করছিল রিনি। বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে, পুরোপুরি পরিণত মানুষ সে আজ। তবুও এখনও সারাজীবনের সেই সুখসূচিগুলো স্বপ্নের মতো লাগে তার, এখনও রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে সে।

“কি করছো রিনি? রাত হয়েছে আর নয় এবার বিশ্রাম নাও।” পরম মমতায় অয়ন তার কাঁধে হাত রাখল। স্যান্ডে রিনিকে ধরে শোবার ঘরে নিয়ে গেল অয়ন।

আগামীকালের স্লাইটে অয়ন আর রিনি দেশে ফিরছে। শেষবারের মত জন্মভূমির মাটি স্পর্শ করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে চাই রিনি। ডাক্তার বলে দিয়েছেন আর কিছুই করার নেই। যে রোগ রিনির শরীরে বাসা বেঁধেছে শত চিকিৎসাতেও তা সারানো গেল না। এখন শুধু অপেক্ষা। সেই অন্ত মুহূর্তের জন্য। শুধু একটাই কস্ট হচ্ছে তার। রিনির দুর্বল প্রেম কে পৃথিবীর বুকে রেখে চলে যেতে হবে তাকে। তার দুর্বল প্রেম তার স্বপ্নের পুরুষ তার আঘিক ভালোবাসা তার অয়ন, তাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে রিনিকে। মৃত্যু অবশ্যিকী। আগে বা পরেই হোক সে আসবেই।

তাই এখন শুধু রিনি এটাই উপলক্ষ্মি করতে চায় “মরণের তুঁহ মম শ্যামও সমান”।





কালচার শক

সৌমেন ঘোষ

আমার ছোটবেলার বন্ধু স্মরজিঃ রায় ওরফে বাবলু এবারে অনেকদিন পরে দেশে এল। সেই কবে '৭০ সালের গোড়ার দিকে খড়গপুর থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেই USA চলে গিয়েছিল। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে MS, Ph.D. করে অনেক বড় বড় কোম্পানিতে কাজ করার পর এখন অবসর জীবন উপভোগ করছে। আগে সপরিবারে দু বছর অন্তর একবার আসতো, সম্প্রতি আসার সময়ের ব্যবধানটা কিছু বেড়ে গেছে। কিন্তু এতো বছর বিদেশে থেকেও ওর কোন পরিবর্তন দেখলাম না। সেই একই রকম ভাবে কাছে টেনে নিয়ে, পিঠ চাপড়ে 'হা হা' করে হেসে আমাদের ছোটবেলার ক্রিকেট, ফুটবল খেলার দিনগুলোর কথা মনে পড়িয়ে দেয়। আমাদের দুজনের জীবনযাত্রার মানের যে একটা ফারাক আছে তা কথনও আমাদের বন্ধুস্বর মধ্যে কোন ব্যবধান সৃষ্টি করে না।

সেদিন নানান গল্পের মধ্যে বাবলু হঠাতেই বলে উঠল, "নাঃ, কলকাতাটা আর বাসের যোগ্য রইল না।" আমি, "কেন, খারাপটা কি দেখলি?" বলতে ও উত্তরে বলল, "তুই নিজে জানিস না কলকাতা কি ছিল আর কি হয়েছে? তোর নিজের চোখেই দেখা '৫০ এর দশকের সেই ছবি কি ভুলে গেছিস ?" চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বাবলু মনে পড়িয়ে দিল, "ভেবে দেখ, দুজনে যখন প্রথম সাইকেল চালান শিখে মিল্টো স্কোয়ার থেকে সোজা ল্যান্ডডাউন রোড ধরে আসতাম? ফাঁকা রাস্তা, দুধারে বড় বড় গাছ আর তেমনই বড় বড় মানুষের বাড়ি, ১ নম্বরে ICS রঞ্জিঃ রায়, ২ নম্বরে advocate S.M. Basu র মতো সব ব্যক্তিস্ব। তারপর বালিগঞ্জ সার্কুলারে মোড় নিলেই সব বিশাল বিশাল বাগান ঘেরা বাড়ি, কোনটা ত্রিপুরার মহারাজার আবার কোনটা রাপোলি পর্দার রাজপুত্র প্রমথশ বড়ুয়ার। পশ দিয়ে Evening in Paris এর আবেশ ছড়িয়ে চলে গেল একটা বিউক, ৮।" আমার দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে বাবলু বলল, "জানিস, আমি কত খোঁজ করেছি Evening in

Paris আর Californian Poppy র সারা আমেরিকায় কিন্তু ওগুলো আর তৈরি হয় না। এতো সুন্দর দুটো সুবাস পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেল।"

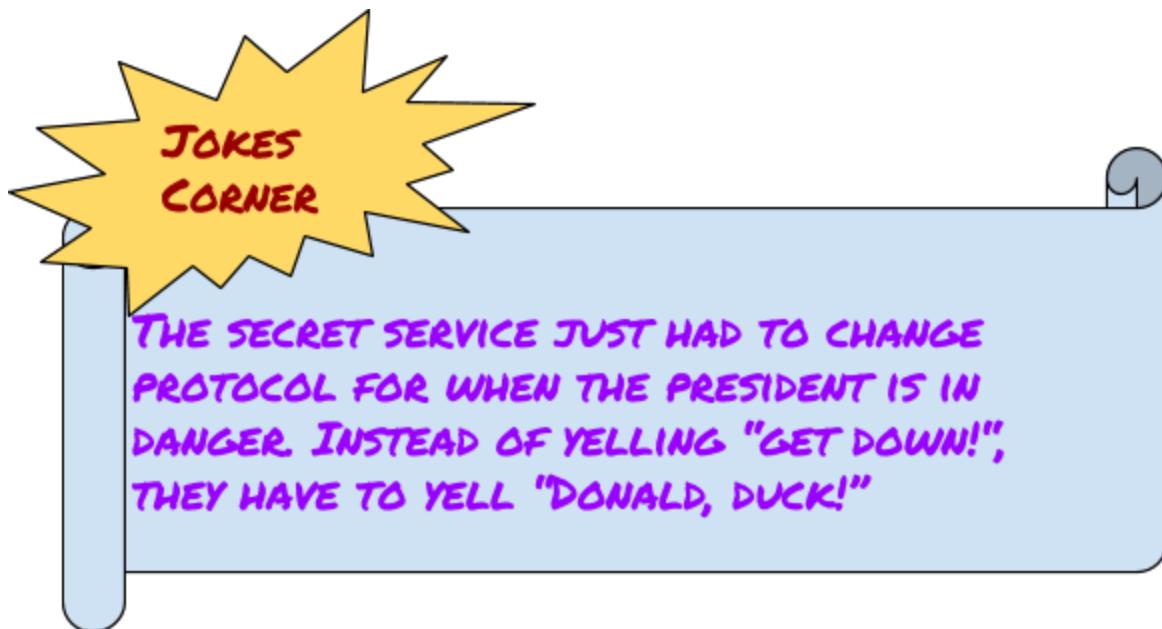
আমি ওকে স্বাস্থ্য দিয়ে বললাম, "পৃথিবী তো রোজই বদলাচ্ছে সেই রকম এখানেও বদল হচ্ছে। তুই যখনকার কথা বলছিস তখন ছিল 'class' এর যুগ আর এখন এমেছে 'জনতার' দিন।" বাবলু চটে গিয়ে বলল, "এটা ঠিক যে class একটা factor যেটাকে আমি অঙ্গীকার করছি না কিন্তু জনতা কি আমি দেখি নি নাকি ? যখন ২/২বি বাসে করে কলেজ যেতাম তখন তাতে যারা প্রেসিডেন্সি, স্কটিশচার্চ, মেডিকেল কলেজ বা কলকাতা university তে যেত তারা কি স্ট্যান্ডার্ড এর ছেলেমেয়ে ছিল বল তো? এরাই তো সমাজের সব ক্ষেত্রে গিয়ে দেশের দশের মুখ উজ্জ্বল করতো। তার সঙ্গে আরো মনে আছে ডালহোসিগামী আপিসের বাবুদের। তাঁদের মতো ব্যক্তিস্ব সম্পন্ন লোকও তো দেখি না এখন।"

স্মৃতিকে আরেকটু উক্ষে দিয়ে বাবলু বলল, "গড়িয়াহাটার মোড়ের বিকেল মনে পড়ে ? যাদবপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং এর ছাত্ররা T হাতে বাস থেকে নামত , কি bright ছেহারা সব। হকার বিহীন চওড়া ফুটপাত, মাঝে সবুজ বুলেভার্ডে ট্রাম চলছে, আলো বলমলে দোকানগুলোর মুখ ঢাকা নয়। সঙ্গে হলেই রাস্তার মোড়ে মোড়ে বেলফুলের গন্ধে মনটা ভরে যেত। দেশপ্রিয় পার্কের মোড়েও কত আজ্ঞা মেরেছি। দেখতে পেতাম 'সুত্রাঞ্চিলি' রেস্টুরেন্টের সামনে শক্তি চঞ্চোপধ্যায়, সুনীল গঙ্গুলদের মতো কবি, লেখকদের বা অন্য দিকে ক্রিকেট খেলেয়াড়দের গল্পগুজব চলছে।" ও একটু হতাশ হয়ে বলে, "এখন বাঙালির প্রতিভা কোথায়? কই আমি তো শুনিন কলকাতায় কোন সায়েন্টিস্ট বা লেখক কিংবা কোন বড় চিচার এর নাম। কটা ছেলে IIT তে যায় এখান থেকে? কটাই

বা হয় IAS IPS ? চারধারে তো দেখি 'celebs' যারা T.V. র সিরিয়ালে করে , তারাই তো দেখি সর্বঘটে !" বাবলু একটা দীর্ঘনিশ্চাস ফেলে বলে "বেশি কথা কি, একটা সমগ্রান্ত চেহারার মানুষই দেখতে পেলাম না। এটা হচ্ছে কেন জানিস ? এখানে সত্যিই 'classless society' হয়ে যাচ্ছে, যে class থেকে talent আসত তা আর নেই"। এর পর ওর স্বভাবসিদ্ধ টংএ আমার পিঠে একটা থাপ্পড় মেরে "চলি রে, আবার একদিন হবে" বলে চলে গেল।

বাবলু চলে যাবার পর রাত্রে মনটা একটু থারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম আমি এখানে থাকি বলেই বোধহয় পরিবর্তনটা অতথানি বুঝতে পারিনা। ও অনেক পরে পরে আসে বলেই হয়ত ওর চোখে পড়ে। সত্যি কি এখানকার মানটা এত নেবে গেছে? রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দের যুগ থেকে যে কৃষ্ণির শুরু আজ কি তা বহন করে নিয়ে যাবার মতো কেউই নেই? সবই কি শেষ হয়ে গেল? এমনকি একটা সমগ্রান্ত চেহারাও নজরে আসে না!

পরদিন সকালে খবরের কাগজের প্রত্যাশায় দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। নিচে তাকিয়ে দেখি যারা যাতায়াত করছে সত্যিই তো তারা ঠিক আমাদের ধরণের নয়। কেমন যেন মিলছে না। হঠাৎ দেখি ও পারে ওষুধের দোকানের সামনে থেকে রাস্তা পেরিয়ে একজন আসছে। বাঃ ভারী সুলন চেহারা তো ! ফর্মা রঙে আর কাটা কাটা নাক, চোখে একটা অভিজাত ভাব। বেশভূষাও খুবই রুটিপূর্ণ। মনে হল "কেন থাকবে না cultured বাঙালি, এই তো আছে।" আমি মাথা ঝুঁকিয়ে মুণ্ড হয়ে দেখতে লাগলাম। সে যখন প্রায় আমাদের বাড়ির কাছাকাছি এসে গেল তখন দেখি হঠাৎ পকেট থেকে কি একটা বার করে বাঁ হাতের তালুতে রাখল। তারপর দু বার ডান হাতের চাপড় মেরে বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে ডলতে লাগল। আমি আর্তনাদ করে বলে উঠলাম "আরে এ কি, এ তো ধৈনি!!" তারপর স্বগতোক্তি করলাম "বাবলু, তুইই বোধহয় ঠিক"। বারান্দায় একটা টুল পাতা ছিল, আমি তাতে বসে পড়লাম।





ভূতের ডায়েরি

শ্রীমতি ভূত

আমি শ্রীমতি ভূত, গত তিনমাস হল তপ্পিতল্লা গুটিয়ে অন্য দেশে ঘোঁটি গেড়েছি। সত্যি কথা বলতে কি, তপ্পিতল্লাটা ঠিক গোটানো যায়নি, কারণ ওই সময়ে যা যা বাঁধাছাঁদা করা হয়েছিল, তার অর্ধেকের ওপর জিনিস পরে ওজন দাঁড়ার রক্তচক্ষুর ফলে রেখে আসতে হয়েছে। শেষবর্ধি অবস্থা এই দাঁড়াল যে তপ্পিতল্লা পুরো দেশেই রইল, তার থেকে খাবলে কটা জিনিসপত্র নিয়ে আমি আমার ছ - বছরের কল্যা কে নিয়ে রওনা হলাম। বাড়ির লোকেরা আমার বিপুল ফেলে যাওয়া সম্পত্তির দিকে তাকিয়ে শান্তনা দিল যে, "কোনো চিন্তা নেই, আমরা সব গুছিয়ে রাখছি, পরের বার এসে নিয়ে যাস"। জিনিসগুলোর দুঃখ আমার থেকে অনেক বেশি আমার মেয়ের প্রাণে বাজল। এই মাঝার কারণ হল ওর খেলনাপাতির ওপরেই কোপটা সব থেকে বেশি পড়েছে। আজও মাঝে মাঝেই ওর নেড়ু ভাট্ট, গয়নাগাঁটি ইত্যাদি নিয়ে ও ঠিক ওপার-বাংলার ছিন্নমূল মানুষদের মতোই বিলাপ করে যাদের এক কথায় সমস্ত সম্পত্তি ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল।

যাকগে, ওসব কথা যাক, এদেশে আসার পরে সাময়িক যে মুঝ্বতা থাকে, তা সকলের মতোই আমারও ছিল। সুন্দর রাস্তাধাট, চারিদিকের সবুজ, অটোমেটিক ব্যবস্থাপনা - সবই অন্যরকম, মুঝ হওয়ার মতো। তবে আজকের লেখাটা দুটি দেশের বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য লেখার জন্য নয়, এটা মূলতঃ আমার কিছু মজাদার অভিজ্ঞতা বলার জন্য।

এদেশে আসার পর প্রথম যে জিনিষটা সবচেয়ে আরামদায়ক ছিল তা হল ঘাম-হীন পরিবেশ। মাইলের পর মাইল হাঁটাই কিন্তু ঘামছি না - এ তো ভাবাই যায়না। কিন্তু এই কথা যথনি কাউকে আনন্দ করে বলতে গেছি তথনি চারপাশের সবাই আমার সুখের গোড়ায় জল ঢেলে দিয়ে বলেছে যে আমরা নাকি এদেশের "সেরা" সময়ে এসেছি। এই সুখের দিন বেশি টিকিবে না। এরপরই নাকি অমা-নিশার মতো ঘনিয়ে আসছে "উইন্টার", তার সঙ্গে তার ভয়াবহ সব বর্ণনা। কি মুশ্কিল! ক' মাস পরে ঠান্ডায় কাঁপব বলে আজ উত্তোলন উপভোগ করব না! কলকাতায় আমার জীবনের ৩৬ বছর কাটানোর পর যে শীতকাল কে উপযোগ না করে ভয় পেতে হবে এটা ভেবেই আমি ভীত।

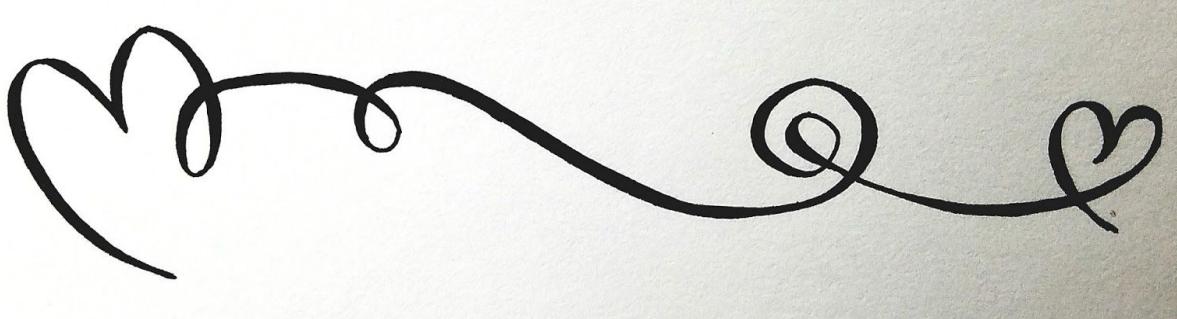
এরপর গেলাম মেয়েকে স্কুল এ ভর্তি করতে। সুন্দর ছিমছাম স্কুল, দারুন সব ব্যবস্থাপনা, হাস্যমুখী শিক্ষিকা (যাদের চেহারা মূর্তি ও পোশাক-আশাক দেখলে হয়তো আমাদের গার্লস স্কুল এর রাগি "মিস" রা ভিরমি থেতে পারেন), খেলা-খেলা-পড়া সব নিয়ে বেশ ভালোই চলছিল। কলকাতায় গত বছর মেয়েকে সঞ্চাহে তিনটে করে পরীক্ষার জন্য তৈরী করে করে হাঁপিয়ে ওঠা আমার মনটা বেশ ফুরফুরে হয়েছিল। একদিন হঠাৎ এক ভীষণ হাস্যমুখী আল্টি আমায় ছুটির পর ডেকে খুব চিন্তাপ্রিয় হয়ে বললেন যে উনি আমার মেয়ের মনস্থান্তিক ব্যাপার নিয়ে কিছু চৰম আলোচনা করতে চান। আমি তো ঘাবড়ে গেলাম, বলে কি রে বাবা! উনি আমায় চেখ গোল গোল করে যারপরলাই ভয়ার্ত মুখ করে জালালেন যে আজ ক্লাস এ সবাইকে যা খুশী আঁকতে দেওয়া হয়েছিল তাতে আমার মেয়ে যীশু শ্রীষ্ট এঁকেছে। আমি তখন মনে মনে ভাবছি যে এদের দেশে বোধহয় আরাধ্য দেবতা কে আঁকার নিয়ম নেই। আবার তারপরেই মনে পড়ছে কিছু বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা শ্রীষ্টের জীবনের নানা বিখ্যাত ছবি। কিন্তু এতে ভয় পাবার যে কি হয়েছে বুঝতে পারছি না। অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছি এবার নিশ্চই উনি ভয়ালক কোনো কীর্তির কথা বলবেন। উনি বললেন, "ও যীশুর হাতে - পায়ে রক্তের দাগ এঁকেছে।" উনি খুব চিন্তিত একটা খুব মেয়ে কেন রক্ত আঁকবে। তবে কি ওর মনের মধ্যে কোনো খুনে প্রবৃত্তি বাসা বাঁধছে! আমি ওনাকে আশ্বস্ত করলাম আসলে আমাদের দেশের সব চার্চে ও ছবিতে, যেখানেই ও যীশু কে দেখছে, সেখানে রক্তাক্ত অবস্থাতেই দেখেছে। আমি বোঝালাম যে ও শুধু বেশি মাত্রায় "specific" হওয়ার চেষ্টা করেছে হয়তো। তাতেও ওনার ভয় কাটেনা। শেষে বললেন, "আচ্ছা আপনি ওকে বারণ করে দেবেন কারণ অন্য বাচ্চারা ভয় পেয়ে যেতে পারে।" আমি ওনার নির্দেশ শিরোধার্য করে বাড়ি ফিরে ছবিটা দেখে তো হেসে গড়াগড়ি খাবার জোগড়ু। ৬ বছরের কাঁচা হাতে একটা মানুষ এঁকেছে দুহাত ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে, যার পায়ে ও হাতে দুটো দুটো চারটে লাল বিন্দু। এই দেখে বাচ্চারা ভয় পেলে তো তাদের মনস্ত্ব নিয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া বেশি দরকারি। এর থেকে বেশি রক্ত তো ওরা বোধহয় ওদের কাঁচুন এ দেখতে অভ্যন্ত।

আমার মাঝে মাঝেই বুক ধড়ফড় করে। এদেশে আবার কিছু হলেই আমাদের মতো ডঃ বিশ্বাস জাতীয় কারো কাছে যাওয়া যায়না, ডেকে পাঠালো তো দূর অস্ত। খুব কষ্ট হল ইমার্জেন্সিতে ফোন করলে ওরা নানা প্রশ্ন করে প্রায় আধমরা করে দেয়, যার মধ্যে একটি প্রশ্ন হল "ARE YOU BREATHING?" বলতে ইচ্ছে করে "না তো ফোনটা কে করল? আমার ভূতে?" যাইহোক, তো এই বুক ধড়ফড় নিয়ে প্রথমে হেল্প লাইন-এ ফোন করে এক বুড়ি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দু-সপ্তাহ বাদে একটা এপ্যেন্টমেন্ট পেয়েছি। আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম ততদিনে আমার রোগ হয় এমনিই সেরে যাবে না তো আবার ইমার্জেন্সি তে ফোন করতে হবে। যাইহোক, তো সেই বহু প্রত্যাশিত ডাক্তারের যথন মুখোমুখি হলাম তখন আবার এক কোটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যেতে হল। বুক যে কত রকম করে ধড়ফড় করতে পারে তা এর আগে বুবত্তেই পারিনি। তো সব শোনার পর তিনি আমায় একটা ইসিজি করতে বললেন ও রাস্তাধাটে বুক বেশি ধড়ফড় করে উঠলে অ্যাঞ্চুলেশ ডাকতে বললেন। ইসিজি করতে হবে শুনে আমি ডাক্তারের সাহায্যার্থে বলার চেষ্টা করলাম যে আমার রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রাও কিন্ত

উর্ধমুখী। যদি তাতে রোগ নির্ধারণের সুবিধা হয়। উনি আমায় মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে খুব বিনীত ভাবে বললেন যে আমার এই প্রক্রিয়ের জন্য যেন আমি আলাদা আরেকটা এপ্যেন্টমেন্ট নিয়ে ওনার কাছে আসি। নিজের কান কে ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না। হায় রে আমাদের ডঃ বিশ্বাস!! যিনি একবার বাড়িতে পা রাখলে সারা বাড়ির লোক দোড়ে এসে যে যার উটকো অসুবিধে বলতে শুরু করত, আর এখানে একই রোগীর দুরকমের রোগ বলার জন্য ভিন্ন দিনে আসতে হবে।

এদেশের সবই আমার কাছে নতুন। নিয়ম কানুন, আচার বিচার সবের সঙ্গে মানিয়ে নিছি ধীরে ধীরে। ভালো জিনিসের সংখ্যাই বেশি খেলা মনে বিচার করতে গেলে। এদের সুন্দর পথ-ঘাট, বাড়ি-ঘর দেখলে মনে হয় আমার শহরটাকেও তো বিটিশেরা এই ধাঁচেই বানিয়েছিল। আমরা রাখতে পারিনি। অনেক প্রতিকূলতা ছিল আমাদের, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজতান্ত্রিক আবার কিছু অভ্যাসগত, যা আমরা জয় করতে পারিনি। এখনও কি চেষ্টা করলে পারা সম্ভব নয়?





জোজোর পুজো বাড়ি

সায়রীঘোষ

যতদূর চোখ যায় সামনে শুধু সবুজ ধানের জমি, মাঝে মাঝে সাদা কাশ্ফুল, তারও পরে প্রায় আকাশের নীলের সঙ্গে মেশা ভৈরবী নদী। আকাশে সাদা মেঘ ভেসে চলেছে ছোট ছোট নৌকার মতো। হাঁ করে জোজো আর তার খুড়ভুতো দিদি তুলি তাকিয়ে ছিল সেইদিকে, এমন সময় হঠাতে পিছন থেকে কাকুল বলে উঠল, “কী হে ভোঞ্চলদাস, এরকম জিনিস দেখেছিস কখনো তোরা?” জোজো আর তুলি মাথা নাড়ল, না তারা এরকম দৃশ্য দেখেনি। “কি করে দেখবো?” তুলি বলল, “কলকাতায় তো শৱৎ কালে শুধু বৃষ্টি আর গরম, ঘাম।” জোজো খ্যাক খ্যাক করে হেসে বলল, “এই দৃশ্য দেখেছি তাপসী আন্টির ক্লাসে বাংলা এসে লিখতে বসে।” কাকুনের সঙ্গে জোজোদের বিশাল কেঁদো ল্যাঙ্গেড়র কুকুর প্রিম্বও ছাদে উঠেছে। সে গিয়ে জোজোর পাশে বসল। কাকুল বলল, “তবেই দেখ কিরকম মজার ব্যাপার হয়ে গেল এই বছর পুজোয়!”

সত্যি কথাই বটে, গল্পে বা সিনেমায় ছাড়া এরকম দেখা যায় না। বরাবর কলকাতায় বাস জোজোদের। পুজোয় বেশিরভাগ সময়েই আর সবার মতো ঠাকুর দেখে, বন্ধুদের সঙ্গে বেরোয়, কখনো হয়ত ছুটিতে কলকাতার বাইরে গেছে, কিন্তু এবারের মতো নয়। আরো মজার ব্যাপার হল কালকের আগে জোজো আর তুলি জানতোই না কেখায় আসা হচ্ছে, তারা যাকে বলে একেবারে surprised। অনেক বছর আগে জোজোদের প্রপিতামহ, মানে যাঁকে ওরা আশ্চর্যদাদু বলে, তাঁর বাড়ি ছিল যশোরের এই গ্রামে। বিদ্যানন্দকাটির পাশে মঙ্গলকোটে ছিল বিশাল বাড়ি, পুরুর, ফলের বাগান, সব। তাঁর পরে কেউ আর যায়নি সেই বাড়ি দেখতে। এত বছর পরে এইবার জোজোদের এক দূরসম্পর্কের জ্যোঠামশাই অরুণ জেরু এসে বলল পুরোনো বাড়ির পুজোটা যদি

পুরুষজীবিত করা যায়। প্রথমে দাদুন আর মেজদাদু ছেড়দাদুর খুব একটা ইচ্ছে ছিল না, “আবার কে এখন বাংলাদেশ যাবে, তিসা বানাতে হবে, সেই বাড়ি কি অবস্থা আছে তাই বা কে জানে ...” এই সব বলতে শুরু করেছিল, তারপর কি ভেবে ওদের মত বদলায়। জোজোর বাবা আর দুই কাকার ইচ্ছে ছিল, হয়তো তাই শেষকালে মত বদলাতে সাহায্য করে। জোজো আর তুলি এত জানতো না। ওদের তখন স্কুলে হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষা। পরীক্ষার পর রেজাল্ট বেরোল, তারপরে ওদের বলা হল যে পুজোয় এবার কলকাতার বাইরে যাওয়া হবে, গ্রামে। “তোরা তো গ্রামের পুজো দেখিসনি, এবারে চল দেখতে পাবি,” আসবাব কয়েকদিন আগে সকালে চা খেতে খেতে কাকাভাই বলল ওদের। ওরা ভেবেছিল বোধহয় ডায়মন্ড হারবার-এর কাছে ওদের একটা বাগান বাড়ি আছে সেখানে যাওয়া হবে। মহালয়ার আগের দিন সন্ধ্যবেলা ওরা এসে পৌছেছে এই বাড়িতে। তখন খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, তাই তাড়াতাড়ি ঝোল ভাত খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল। আজ ভোরে উঠে মহালয়া শুনেছে, তারপরে একটু সকাল হতেই বিশাল ছাতে উঠে দেখে এই দৃশ্য!

নীচে ততক্ষণে সকালের জলখাবার নিয়ে ডাকাডাকি শুরু হয়ে গেছে। বাড়িতে সকালে দুধ, ডিম, আর পাঁউরাটি খায় ওরা, কিন্তু এখানে সকালে দিদুন, মেজদাদু আর মা-কাকিমারা সকাল-সকাল উঠেই লুচি আর কারিপাতার আলুর দম বানিয়ে ফেলেছে। সেই খেয়ে তাড়াতাড়ি প্রিঙ্গ কে নিয়ে ওরা বসন্ত-দার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল গ্রাম দেখতে। কিন্তু বেশিরভাগ যেতে হলনা। বাড়ি থেকে নদীর দিকে বেরোতেই দেখে ঢাকীরা আসছে। তাদের নৌকা এসে থামল, আর ঢাকীরা ঢাক বাজাতে বাজাতে নদী থেকে উঠে এল পায়ে চলা পথ দিয়ে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। ওদিকে বাড়িতে ঠাকুর তৈরী হচ্ছে। পাড়ার পুজোয় ঠাকুর

আসতে দেখেছে ওরা ট্রাকে করে, কুমোরটুলিতে ঠাকুর তৈরী হয় জানে, কিন্তু চোখের সামনে মাটির ঠাকুরের মূর্তি তৈরী হচ্ছে দেখে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিল জোজো-তুলি। বসন্ত-দা আবার রাংতা দিয়ে ঠাকুরের গয়না বানানো দেখছিল খুব মনযোগী হয়ে। সানা সকালটা এই করেই কেটে গেল প্রায়, দুপুরে চান সেরে খেয়ে নিতে হল। কত নতুন রকমের তরকারি আর মাছ খেল ওরা। তুলি মাছ খেতে পছন্দ করে না একেবারে, তবে পাবদা মাছের সরষে দিয়ে ঝাল খেয়ে নিল বেশ চেটেপুটে। জোজো তো মাছের নামে ওঠে বসে, তার আনন্দের সীমা নেই।



মন্দেশ আর
আনন্দমেলা
দুটো
পূজাৰ্বিকীই
নিয়ে এসেছে
জোজোৱা।
দুপুরে খাওয়াৱ
পৰ ছাদেৱ ঘৰে
সল্দেশটা নিয়ে
গিয়ে পড়ছিল
জোজো। পুৱো
বাড়িটা পৰিষ্কাৰ
কৰা খুব
শ্ৰমসাৰ্ধ্য
ব্যাপৱ, তবুও
উতৱ দিকেৱ

একটা মহল (যা বিশাল এক একটা দিক, তাকে মহলই বলা যায়) ভালোই পৰিষ্কাৰ কৰা হয়েছিল। ছাদেৱ এই ঘৰটা ছোট হলেও নদী দেখা যায় আৱ নাৱকোল গাছেৱ মাথা। খুব সুন্দৰ হাওয়া দিছিল। তার মধ্যেই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছে জোজো। ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছে যেন অনেক দিন আগে পুজো হচ্ছে এই বাড়িতে। অনেক লোকজন ঘোৱাঘুৱি কৰছে, ঢাক বাজছে, আলো জ্বলছে কত। ঘুম ভাঙল প্ৰিন্সেৱ ঠেলাঠেলিতে। এৱ মধ্যে কখন প্ৰিন্স ওপৱে উঠে এসেছে আৱ জোজোৱা যে ঘোঁষে গুঁতোগুঁতি কৰছে। “আঃ প্ৰিন্স ঘুমোতে দাও” বলে জোজো জাজিমেৱ ওপৱ ওপাশ ফিৰল, তবু ঘুমটা ভেঙে যাওয়ায় মনে হল প্ৰিন্স উঠে ঘৰে কিসিব শুঁকছে। ঘৰময় ঘোৱাঘুৱি কৰে এটা ওটা শুঁকছিল ও। “ওদেৱ তো ওই কাজ” ভেবে জোজো আবার ঘুমোতে চেষ্টা কৰল কিন্তু আৱ ঘুম এল না। উঠে চশমা পৱে জোজো দেখল প্ৰিন্স যেটা শুঁকছে সেটা একটা পুৱোনো ট্ৰাঙ্ক। “এটা খুলতে হবে”, ভাৰল জোজো। পুৱোনো আলমাৱি, ট্ৰাঙ্ক খুলে ঘাঁটিতে জোজো খুব ভালোবাসে। আৱ সেখান থেকে ভালো কিছু জিনিস পাওয়া গেলে ও নিতেও চায়, যাৱ ফলে মা ওকে “ৱাষ্পৰ বোয়াল” বলে। বাসনেৱ সিন্দুক খোলা হলে একটা পাথৱেৱ ছোট বাটি, কি পুজোৱ ট্ৰাঙ্ক থেকে একটা ঘন্টা, এগুলো ও নেয়। তবে তখন আলো পড়ে আসায়

ট্ৰাঙ্ক খোলাৱ চেষ্টা স্থগিত রাখল জোজো। “দিদিভাই কে ডাকতে হবে, বসন্ত-দা কেও, এৱ মধ্যে আবার যদি টিকটিকি থাকে তাহলেই হয়েছে”।

বড়োদেৱ এখনি কিছু বলা হবেনা বলেই ঠিক কৰা হল। বড়োদেৱ কাজ যে শুধু ছোটদেৱ ইচ্ছেয় বাধা দেওয়াৱ সে কথা রৱিন্দ্ৰলাখ থেকে জোজো পৰ্যন্ত সবাই জানে। এখানে সন্ধে হলেই প্ৰায় ঘুটেঘুটে অন্ধকাৰ হয়ে যায়। পুৰেৱ বড় ঘৰে সবাই মিলে জমায়েত হল জোজোৱা। গল্প, ভূতেৱ গল্প, গান, dumb charade সব হল। রাতে থেকে বসল সবাই নিচেৱ দালানে, রান্নাঘৰেৱ সামনে। কাঁসাৱ থালায় গৱম ভাত, কি ভারী ভারী বাটি সব। তাতে মাছেৱ মুড়ো দিয়ে সোনামুগেৱ ডাল, নাৱকোল দিয়ে ফুলকপি, ইলিশেৱ পাতুৱি, ফুলকপি দিয়ে কৈ মাছেৱ ঝোল, সে সব দুৰ্দল্লভ সব থাবাৱ। বাড়িতে জোজোৱা সবাই টেবিলে বসে থায়। আৱ অৱৰণ জেঠু বা মেজদাদু, ছোড়দাদুৱা তো জোজোদেৱ সঙ্গে এক বাড়িতে থাকেনলা। এখানে আগে জোজো, তুলি, আৱ বসন্ত-দা রান্নাঘৰেই বসে থেয়ে নিল। প্ৰিন্সও ওদেৱ সঙ্গে বসে মাংস-ভাত খেল। তাৱপৱে দাদুৱা, বাবা, কাকুল, কাকাভাই, বাবুল-কাকা, বাবু-কাকা, আৱ অৱৰণ জেঠু খেল দালানে। পৱে মেয়েৱা বসবে ওদেৱ হলে পৱে। তাৱপৱে সেই আগেকাৱাদিনেৱ মতো, রান্নাঘৰ পৰিষ্কাৰ হবে। তাহলে পৱে ওপৱে আসবে সবাই।

পৱেৱ দিন সকালেই জোজো, তুলি, আৱ বসন্ত-দা ছাদেৱ ওই ঘৱটাতে গিয়ে সিন্দুকটা খোলাৱ চেষ্টা চালাতে লাগল। তাৱ গায়ে একটা বিশাল তালা, আৱ অবশ্যই সেই প্ৰাচীন তালাৱ কোনও চাৰি আশেপাশে পাওয়া গেল না। ওই তালা ভাঙতে গেলে টেলিদার ভাষায় “কামাল” নয়, “কামাল” দাগতে হবে। তাৰাড়া বড়োদেৱ জানানো হচ্ছে না বলেই আৱও মুশকিল। প্ৰথমেই তো সবাই চেঁচামিচি কৰে বলবে, “হাত দিস না, হাত দিস না, কি না কি পোকামাকড় বেৱোবে, কামড়ে দেবো।” যেন সিন্দুক বাক্স পুৱনো হলেই তাৱ মধ্যে পোকামাকড়, সাপখোপদেৱ ঝঁট বাক্স হয়ে যায়, ভাৱা থাকে ওৱা! যাই হোক তালা ভাঙোৱ ব্যাপৱে শেষকালে কাকাভাইকে ডাকা হল, কাৱণ তাৱ দিয়ে মোচড় দিলে তালা খুলে যায় থিয়োৱিটা বসন্ত-দা জানতো ঠিকই, কিন্তু হাতে কলমে ও কৱতে পাৱল না। সেই সিন্দুক খুলে বেৱোল অনেকগুলো বাসন, ক্লোপ, কাঁসা, পাথৱেৱ তৈৱী সব থালা-বাটি-গেলাস, আৱ একটা সিঙ্কেৰ কাপড়ে বাঁধা থাতা। সেই থাতার লাল চামড়ায় বাঁধানো মলাটোৱ রং উঠে গেছে জায়গায়-জায়গায়, সোনার জলে ছাপানো নামটাও উঠে এসেছে, তাও জোজোৱা পড়তে পাৱল “শ্ৰী ইন্দ্ৰনারায়ণ ঘোষ”। বেশিৱভাগ হলদে হয়ে আসা পাতাগুলো থালি, মাঝেৱ কিছু পাতায় পুজোৱ কথা লেখা আছে। দুপুৰবেলায় বড়োৱা হৰমড়ি থেয়ে সেগুলো detail এ

পড়ল। বাবা বলল, “উনি তো মনে হচ্ছে ১৫০ বছর আগেকার কথা বলেছেন।” তখন সবাই হিসেবে করতে লাগল কত generation আগেকার পুঁজো এটা। দিনুন বলল, “কিন্তু এখানে পুঁজোর কোনও নিয়ম লিখেছেন কিনা তোমরা দেখো না, তাহলে আমরা সেগুলো মানতে পারিন।” সেই শুনে তুলি হাঁটমাঁট করে উঠে বলল, “না না আমরা পাঁঠাবলি দেব না কিন্তু!!” সেই শুনে জোজোও চেঁচাতে লাগল, “না পাঁঠাবলি হবে না কক্ষনো!!” ওদের কোনোমতে চুপ করাল সবাই, “আরে না রে, কেউ পাঁঠাবলি দেবে না।”

এর মধ্যে জানা গেল দুটো খুব মজার জিনিস। ঠাকুরের ভোগ হয় সকালে ভাতে সেক্ষ দিয়ে। “ভাতে সেক্ষ? মানে ভাতে ভাত? সেই খেয়ে কি দুর্গা ঠাকুর তাড়াতাড়ি করে স্কুল বাস ধরতে যায়?” প্রিমের পিঠে ঠেস দিয়ে বসে জোজো জিজ্ঞেস করলো। মা বুবিয়ে বলল, “আরে না রে হাঁদা, দুর্গা ঠাকুর স্কুলে যেতেন না। ঠাকুরকে সবাই বাড়ির মেয়ের মতো মনে করেন, তাই বাড়ির মেয়েরা, বাচ্চারা যা খায়, ঠাকুরকে সেটাই দেওয়া হয়। এটাই বাঙালিদের মজার ব্যাপার। পড়িসনি সতেজ দত্তের কবিতায় - দেবতারে সেরা আঞ্জীয় জানি?” দ্বিতীয় জিনিসটাও মজার, ঠাকুরকে যে গয়না পরানো হয় তার একভাগ হল বাড়ির মেয়েদের গয়না। মানে আরেকটা বোন থাকলে তারা যেমন তাকে নিজের গয়না পরতে দিত, সেইরকম। তবে ঠাকুরের নিজের গয়নাও আছে রাখা। কাকিমণি জিজ্ঞেস করলেন, “কোথায় রাখা আছে সেই গয়না?” সবাই দাদুদের দিকে তাকাল, “বাবা, আপনারা কিছু জানেন? শেষ কবে পুঁজো হয়েছিল?” দাদুন আর তার ভাইরা ময়দানে কালীঘাট ক্লাব শেষ কবে কেমন খেলেছিল বলে দিতে পারতেন কোনও অসুবিধে ছাড়া, তবে এই ব্যাপারে কিছুই বলতে পারলেন না। অরুণ জের্টও অনেক ভাবার চেষ্টা করলেন, আর কোনও শরিকরা কিছু জানতে পারে কিনা তাই নিয়েও চিন্তা ভাবনা চলতে লাগল প্রায় সারাদিন ধরে।

বিকেলে জোজো, তুলি, বসন্ত-দা আর প্রিম নদীর পাশে বেড়াচ্ছিল। বাড়িটা একটু বাইরে থেকে কি অস্তুত সুন্দর দেখাচ্ছিল, বিশেষত: যে দিকটা এখনো সারানো হয়নি। তুলি সেদিকে তাকিয়ে ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, “আরও কত কী আছে ওই দিকগুলোতে ভাবা!” বসন্ত-দা বলল, “আচ্ছা ওই দিকেই কোথাও ঠাকুরের গয়নাগুলো রাখা নেই তো? হয়ত আরেকটা সিন্দুর এ?” “থাকলেও বা আমরা খুঁজবো কি করে?” তুলি জিজ্ঞেস করল। জোজো বলল, “আমরা খুঁজবো না, প্রিম খুঁজবো! প্রিমকে আমরা ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষের ডায়েরি টা শুঁকতে দেব, তারপরে ও বাকি আর যা যা আছে ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষের সব খুঁজে বের করে দেবো।” “এই ১৫০ বছর ধরে ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষের গন্ধ লেগে আছে নাকি এই পুরনো বাড়িতে?” তুলির গলায় সন্দেহ। “দেখাই যাক না!!”

বলল জোজো। তাড়াতাড়ি করে ওরা প্রিমকে নিয়ে গেল ডায়েরি শোঁকাতে।

ঠাকুর প্রায় তৈরী হয়ে গেছে, এমনি সময়ে হলে জোজোরা ত্রিখানে থাবা গেড়ে বসে থাকত, কিন্তু তখন ওরা ব্যস্ত প্রিমকে নিয়ে। “কী রে, তুই যে আল্লনা দিবি বলেছিল?” তুলিকে কাকিমণি জিজ্ঞেস করলেন ঠাকুর দালানে chalk দিয়ে আল্লনার ডিসাইন-এর একটা rough আঁকতে আঁকতে। কিন্তু তুলি “পরে হবে” বলে দৌড়ে চলে গেল। থানিক পরে জোজো একটা বড় টর্চ নিয়ে দৌড়ে গেল, তারপরে প্রিমকে নিয়ে বসন্ত-দা গেল। “এদের কি ব্যাপার বলতো?” মা আশ্চর্য হয়ে মণিমা আর কাকিমণিকে জিজ্ঞেস করল। কিন্তু কেউই কিছু বলতে পারল না। দুপুরবেলা দক্ষিণ, আর পশ্চিমের মহলগুলো টেহল দিল প্রিম-বাহিনী। কোনও কোনও ঘরে কিছু নেই, আবার কোনও ঘরে অনেক জিনিস সৃপীকৃত হয়ে আছে। কেখাও পুরনো, ভাঙা খট-পালং, চেয়ার সব জড়ে করা। আয়নার কাচ ধূলো জমে ঘোলাটে হয়ে গেছে, আলোর ডোমগুলোরও সেই অবস্থা, মানে যেগুলো না ভাঙা অবস্থায় আছে আর কি। মোট কথা প্রিম শুধু ল্যাজ লেড়ে নেড়ে হেঁটে চলল, কোথাও শুঁকে কিছু পেল না। শোঁকবার খুব কোনও ইচ্ছেও প্রকাশ করল না। সাপখোপ কোথাও ছিল না ঠিকই, তবে টিকটিকি অনেক ছিল, আরশুলাও। আর প্রচণ্ড ধূলো। মানুষ থাকার যে দুটো মহল (জোজোদের টা ছাড়া) তা হল দক্ষিণ আর পশ্চিম। পুবের মহলটা ছিল থাজাঞ্চিখানা। সেটায় ওরা গেল সবথেকে পরে।

পুবের জানলাগুলো থেকে খুব সুন্দর নদী দেখা যায়। অন্য সময়ে হলে ওরা বসে দেখত, কিন্তু তখন ওরা শুধু টর্চ নিয়ে আনাচে কানাচে খুঁজে ডিটেক্টিভদের মত কোনও ক্লু পাওয়া যায় যদি। প্রিম একটা চাদর চাপা দেওয়া কিছুর ওপর ধাক্কা মারল দু পায়ে দাঁড়িয়ে, তাড়াতাড়ি করে বসন্ত-দা ধরে না ফেললে সেটা পড়ে যেত। দেখা গেল সেটা আরেকটা সিন্দুর। সেটা খুলতে গিয়ে দেখা গেল তার latch টা ভাঙা। কতগুলো পুরনো বেনারসী শাড়ী ছাড়া আর কিছু ছিলনা তাতে। “দূর এত খুঁজে কিছু পাওয়া যাচ্ছে না” বলে জোজো বিরক্ত হয়ে ওই ধূলোর মধ্যেই বসে পড়ল, তুলি দুঃখিত হয়ে জানলার বাইরে তাকিয়ে রাখল আর বসন্ত-দা ট্রাঙ্কটা আবার বন্ধ করতে গেল তখন প্রিম নাক দিয়ে ঠেলে ঠেলে কিছু একটা নিয়ে এল। ওরা খুলে আশ্চর্য হয়ে দেখল ছেট্ট ভেলভেটের বাক্সের মধ্যে একটা পাথর বসানো কানের দুল। “ইয়ে!!!!!!” বলে চেঁচিয়ে উঠল জোজো। “দেখেছ প্রিম ঠিক খুঁজে পেয়েছে। এটা ঠাকুরের হীরে বসানো কানের দুল।” “তুই থাম”, তুলি বলে উঠল। “আর যদি হয়েওবা, একটা দুল দিয়ে কি হবে?” “তবে আশেপাশে আরও কিছু থাকতে পারে, সেটা আশ্চর্য না”, বসন্ত-দা বলল, আর চারিধারে দেখতে লাগল। ঘরটা লম্বাটে, দেখলেই বোঝা যায়

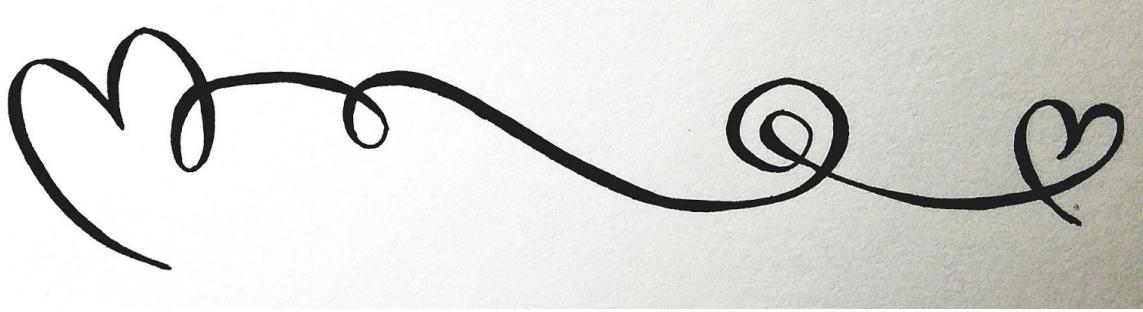
আগে সার দিয়ে লোক বসে জমিদারির হিসেবে করত এখানে। মাথার ওপর আলো লাগানোর জায়গা, যেখানে তেলের আলো জ্বলতো। তুলিও ঘুরে দেখছিল, হঠাৎ হেঁচট খেল কিসে। ভালো করে দেখা গেল মাটিতে একটা suitcase এর handle এর মত জিনিস। মানে যেন ওটা ধরে টেনে তোলা যাবে কিছু। অত ধূলোর মধ্যে ভাল করে আর কিছু দেখা যাচ্ছিল না। পা দিয়ে পাশটা একটু পরিষ্কার করতে বোৰা গেল মাটিতে একটা গর্ত আছে যেটার মধ্যে সিন্দুর ভরে দেওয়া যায়। তারপরে আবার ওর ভারী slab টা চাপা দিয়ে দিতে হয়। পুরো জিনিসটার ওপর যদি তত্পোষ বা জাজিমের মত কিছু পাতা থাকে তো কেউ আর বাইরে থেকে বুবাতে পারবে না কোথায় সিন্দুর আছে। ওরা তিনজনে মিলে টানাটানি করে অল্প একটু নাড়াতে পারল ওই ওপরের slab টাকে। “না: আমরা পারব না, লোক ডাকতে হবে”, বস্ত্র-দা বলল। তখন আলোও পড়ে আসছে, এখনি ওদের খোঁজ পড়বে, তাই তখনকার মত রাণে ভঙ্গ দিল ওরা।

রাতে যখন বড়োরা থাচ্ছে তখন তুলি গিয়ে বলল, “আচ্ছা, ধর যদি ঠাকুরের গয়নাগুলো পাওয়া যায়, তাহলে কি করবে তোমরা?” “কি করবো? ঠাকুরকে পরাবো”, দাদুন বলল। “তোমরা জানো গয়নাগুলো কেমন দেখতে?” জোজো জিজ্ঞেস করল। মনে মনে ও মিলিয়ে নিতে চাইছে প্রিন্স যেটা পেয়েছে সেটার সঙ্গে। অরুণ জেরু বলল, “আমার অল্প অল্প মনে পড়ে, মাথার মুকুট ছিল সোনার, আর হীরে বসানো কানের দুল, গলার হার, আর একটা নথ।” হীরের দুল কথাতে জোজো, তুলি, আর বস্ত্র-দা এ ওর দিকে চট করে দেখে নিয়েছে। “আচ্ছা, আমরা যদি গয়নাগুলো খুঁজে দিই?” মরীয়া হয়ে জোজো বলে ফেলল। “তোরা খুঁজে দিবি মানে? তোরা কোথায় পাবি?” সবাই হাঁ করে তাকাল ওদের দিকে। বাবুল-কাকা বলল, “খুব বুঝি detective গুরু পড়ছিস তোরা, না রে?” “প্রিন্স খুঁজে পেয়েছে ঠাকুরের দুল”, তুলি খুব জোর দিয়ে বলল। “সে কি?” সবার ভাত খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল এই কথা শুনে।

“কোথায় সেটা?” মেজদাদু জিজ্ঞেস করলেন। বস্ত্র-দা ওর শার্টের পকেট থেকে কাগজে মোড়া একটা ছোট জিনিস দিল। অরুণ জেরু দেখে বলল, “আরে হ্যাঁ!!! এ কি কাণ্ড!!!” “সত্তিই এটা ঠাকুরের দুল?” দাদুন আবার জিজ্ঞেস করলেন অরুণ জেরু কে। “তোমার ঠিক মনে আছে?” “হ্যাঁ আমার ঠিক মনে আছে”, অরুণ জেরু খুবই কনফিডেন্সের সঙ্গে বলল। সবাই যখন শুনল কিরকম করে প্রিন্স খুঁজে বের করেছে তখন বাবা বলল, “বেশ কাল তাহলে লোক ডেকে সিন্দুর তোলানো হবে, দেখা যাক কি বেরোয়।”

সেই রাতে জোজোরা প্রায় ঘুমাতেই পারল না। ভোরবেলায় যখন উঠেন আর ঠাকুরদালান পরিষ্কার করতে লোক এসেছে তখন কাকাভাই গিয়ে তাদের ধরলেন সিন্দুর তোলবার জন্যে। শাবল দিয়ে জমে যাওয়া মাটি ভেঙে ওপরের slab টা সরানো হল। তলায় দেখা গেল একটা সিন্দুর আছে ঠিকই। সেটাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হল বাইরে উঠেনো। তার মধ্যে থেকে বেরোল প্রাচুর পুজোর বাসন, কাঁসর, ঘন্টা, প্রদীপ, ১০৮ প্রদীপ, আর কাশ্মীরি কাঠের বাঞ্ছে ঠাকুরের গয়না। অরুণ জেরু যা যা বলেছিলেন সব মিলে গেল সেখানে! ৭০ বছর পুরনো হলেও শরৎকালের সোনালি সূর্যের আলোয় ঝলমল করে উঠল সেগুলো। সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল দেখে।

সেদিন ষষ্ঠী। সকালেই স্যাকরার দোকান থেকে সব গয়না পরিষ্কার করিয়ে আলা হয়েছে, কাঁসার আর কাপোর বাসন পালিশ করানো হয়েছে। তখন বোধন শুরু হয়েছে, জোজোরা নতুন জামা পরেছে, প্রিন্স জরি বসানো জ্যাকেট পরেছে। প্রদীপের আলো আর ঝাড়লঠনের আলোয় ঠাকুরের সাজ ঝলমল করছে। জোজোর মনে হল ও সেই প্রথমদিন বিকেলে ঘুমিয়ে যে স্বপ্ন দেখেছিল সেটাই যেন সত্যি হয়ে উঠেছে। ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষের সাধের পুজো আবার শুরু হল।



একটি মেয়ে ও আটা

শ্রীনিকা রায়

একসময় একটা ভাড়া বাড়িতে একটা মেয়ে থাকতো বাবা মায়ের সঙ্গে। একদিন তার মা আটা মাখছিল। মেয়েটার দেখে একটু আটা নিয়ে খেলতে ইচ্ছা করল। তখন ওর মা ওকে একটা হেট্ট আটার বল দিল খেলার জন্য। বাবা বলল, “সাবধান! আটা কার্পেট পড়লে আটাকে যাবে, আর উঠবে না।” মেয়েটা সাবধানে খেলা সংস্করণ থানিকটা আটা হাত থেকে পড়ে কার্পেট আটাকে গেল। কিছুতেই সেটাকে তেলা গেল না। যখন ইন্সপেক্টর এল বাড়ি দেখতে, ওই আটা চিপকানো কার্পেট দেখে তো রেংগে বলল, “এর জন্যে আমি তোমাদের ফাইন করব।” কিন্তু ইন্সপেক্টর তার

থাতায় কিছুতেই লিখতে পারল না ফাইন করার কারণ। বুঝতেই পারল না ওটা কি জিনিস আটকে আছে। একবার ভাবল চুহঁ গাম, একবার ভাবল পোকার বাসা। এদিকে ঠিকঠাক কারণ না দেখাতে পারলে তো মুশকিল, ফাইন করা যাবে না। তখন মেয়েটা বলল, “আমি তোমাকে বলে দিতে পারি ওটা কি যদি তুমি আমাদের ফাইন না কর।” ইন্সপেক্টর রাজি হল। মেয়েটা বলে দিল যে ওটা আটার বল ও সেই যাত্রা রেহাই পেল।”

সম্পাদিকার নোট: শ্রীনিকার বয়স ৬ বছর।

নতুন ধাঁধা

১। একটা লোক রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। কোনো ল্যাম্পপোস্টে আলো জ্বলছে না, আসে পাশের বাড়ি ওলোয় আলো জ্বলছে না, কোথাও কোনো আলো জ্বলছে না, তবুও লোকটা দিব্যি হাঁটছে। কি করে?

২। একটা ঝুড়ি থেকে পর পর ডিম মাটিতে ফেলা হচ্ছিল। একই ভাবে, এই দূরত্ব থেকে ফেলা হচ্ছিল। সব কটা ডিমই মাটিতে পড়ে ফেটে যাচ্ছিল, একটা ফাটল না। চিড়ি খেলো কিন্তু ফাটল না। কেন?

৩। একটা জাপানি-জাহাজে খুন হয়েছে। পুলিশ চার জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করল ও একজনকে খুনি বলে ধরে নিয়ে গেল।

- একজন বলল সে সকলের জন্য রান্না করছিল
- একজন বলল সে জাহাজ চালাচ্ছিল
- একজন বলল সে মাস্তলের পতাকাটি সোজা করছিল
- একজন বললো সে গিটার বাজিয়ে গান গাইছিল।

পুলিশ কাকে ধরে নিয়ে গেল?

৪। একটা _____ মেয়ে একদিন একটা _____ র দোকানে _____ কিনতে গেছিল। পথে এক দাদুর সঙ্গে ধাক্কা লাগে আর হাতের সব কটা _____ পড়ে যায়। তখন ও _____ হেসে সরি বলে ও ব্যাপরটা মিটে যায়। হল না এটা একটা _____ গল্প? সব কটা গ্যাপ এ একটাই শব্দ বসবে। সেটা কি?

**উত্তর শেষের পাতায় **

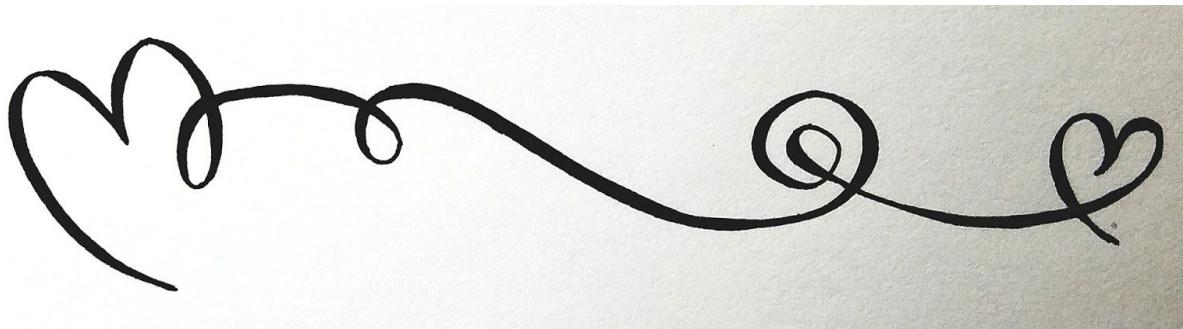


Photo Journal - Australia and New Zealand

Subrata Ghosh



Sydney Harbour Bridge at evening



Koala bear on the tree

Maori Handicraft, New Zealand



Milford Sound, New Zealand

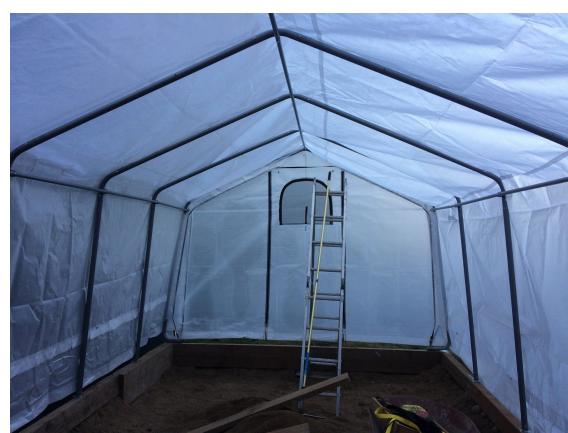


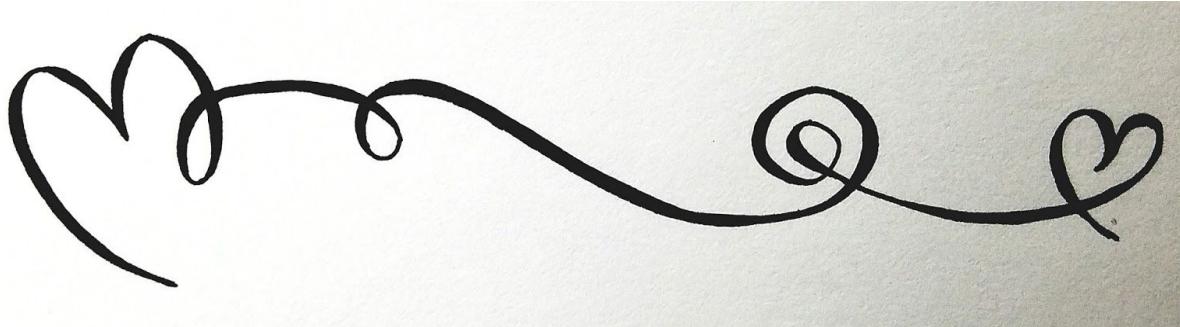


Project Planet Earth

Eric Holcomb

In the Pacific Northwest of the North American Continent on planet Earth (150M Km from Sol, you know, the blue one), the growing season is relatively short and moist. Naked apes of the family hominidae and genus homo have discovered the use of artificial environments such as this can extend the growing season sufficiently to produce various edible vegetables. The photos in this series show such a naked ape, possibly a radiation damaged silver-back, constructing a growth habitat in its native environment. The beast is clearly prepared to defend its nest (its exposed fangs are the main indicator).





Wave Surfer

Thomas Quigley



The Ed: What made you to take up surfing?

Thomas: It was all by accident. I was signed up to become a white water rafting guide the summer after my sophomore year (second year) in

college, with training starting during spring break. For some reason, I wasn't able to make it to the training so I changed my plans last minute and traveled to the Oregon coast with my best friends on my University of Washington (UW) swim team. We rented wetsuits and boogie boards and immediately fell in love with riding waves. By the end of that trip, all of us had bought used wetsuits and surfboards. We then spent every weekend at the coast teaching ourselves how to ride those beautiful waves.

The Ed: Tell us a little about your background in swimming.

Thomas: From an early age, I was drawn to the water. Some of my best childhood memories

were of my times in the ocean while visiting my grandparents in Florida. But being landlocked during my childhood, I had to settle for swimming. I swam competitively from age 9 until I graduated from college. I was fortunate to have some amazing coaches that have inspired me throughout my life. I was always an average swimmer until one day my coach pulled me out of the water and told me that I could be one of the best butterflyers in the state if I applied myself. From that day on, I was a butterfly. If you don't know that stroke, it is one of the hardest, most grueling of the 4 main strokes (butterfly, backstroke, breaststroke and freestyle(crawl)). But he was right, I improved to the point that I was able to compete in the Texas state championships as well as USA Swimming Jr. and Sr. Nationals. It even got me onto the UW swim team where I finished off my career.

The Ed: Do you think swimming as kid made you interested towards water sports in general?

Thomas: Without a doubt. But more importantly it gave me confidence in water so that I know that I can survive almost any situation.

The Ed: What is the most challenging thing about surfing?

Thomas: Reading the wave. This is something that surfers try to perfect their entire lives. Surfing is more than just paddling and standing up. You have to get to know the ocean, be able to read the signs when a set is coming in, know where to position yourself in the perfect spot so that you can catch that magical wave.

The Ed: Has there been an incident where you were terribly afraid and thought you won't make it back to the shore alive?

Thomas: Several, but one sticks out more than the rest. I was in Neah Bay, Washington at a beach called Shi Shi near the Makah Indian Reservation. The beach is a 1 hour hike from the closest civilization. I was with a friend who was as capable in the water as myself so we felt confident. We had no idea this was going to be the biggest swell we had ever seen. The waves were 15-18 foot and the paddle out was very rough. In fact, my buddy didn't make it out to the lineup (where you can catch the waves). I was out there alone, but wasn't about to pass up the chance to ride the wave of my life. I was able to catch two 15 foot waves that were amazing! Then I caught my 3rd wave of the day...and my last. I caught the wave fine, but when the wave crashed, it crashed on top of me pushing me down to the bottom of the ocean. I was pinned down there for 2 very long waves, surfaced, and then was forced back down to the bottom for another 2 long waves.

The Ed: What did you do then?

Thomas: At this point I was sure I wouldn't make it back so instead of fighting it, I just relaxed and let whatever was going to happen, happen. And out of nowhere, I surfaced and was able to take my first breaths...I was alive! Till this day, that is my scariest and most epic day of surfing.

The Ed: What has been your best surfing moment?

Thomas: There are many, but the most magical has to be surfing a wave called Pavones in Costa Rica. It's extremely long and just beautiful. I traveled there with one of my best friends and we had an amazing time. We both caught about 3 waves. Only 3 waves you say? No, these are the longest waves we have ridden in our entire lives. They are at least 300 yards long, and after you ride the wave, you have to walk back up the point because paddling back out would take forever. After I caught my 3rd wave, I stepped on something in the water that caused my foot to swell up, so our trip there was over, but will stay in our memories for ever.

The Ed: What are some other water activities you enjoy?

Thomas: Swimming, Stand Up Paddle Boarding, wake surfing, wakeboarding, water skiing, canoeing, kayaking, SCUBA diving and I always include Snowboarding because you are sliding over frozen water.

The Ed: What is your most favorite surf spot?

Thomas: That's a tough one, I love to travel to faraway places to surf, but the most magical spots are here in the Pacific Northwest. It's quiet, uncrowded, and the scenery is unmatched.

The Ed: What do you love most about water activities?

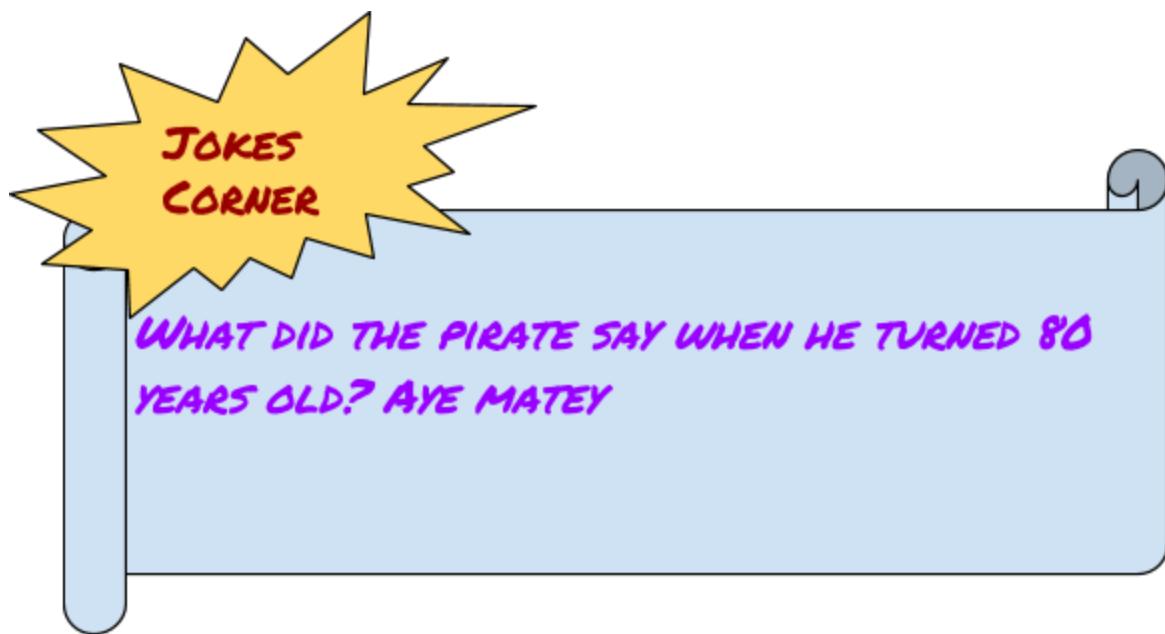
Thomas: I feel more at home in the water than I do on land. When I'm in or on the water, I feel free. It can be calming, or exhilarating, it can be good exercise, or scare the wits out of you, you can ride on the surface or dive deep below. It's Amazing.

The Ed: What advice do you have for younger people who want to challenge themselves to learn any kind of new physical activity?

Thomas: Get out there and do it. Go give it a try even if you are scared. But always be safe. Use the right equipment, have a buddy, and know your strengths and weaknesses. And don't hesitate to ask for help.



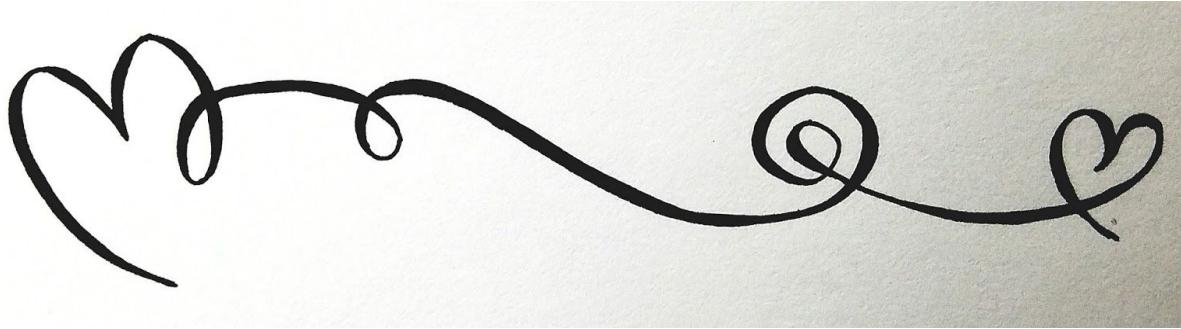
Photo courtesy: Thomas Quigley





International Food Court

I firmly believe that cooking is an art. You can choose to spend just enough effort in cooking because you need food to survive, or you can figure out a way to find a new recipe, cook through it, and discover the joy of creation. Cooking for survival is a necessity, but we don't have to limit it to just that. Discovering new foods is no less exciting than discovering new lands. Keeping that in mind, we have focused on a diverse array of foods for this edition. An easy way to enrich our lives is by opening our minds (and palate) to new foods. Syed Mujtaba Ali, a great Bengali author celebrated for his unique style of humor, once mentioned that one who is not open to a new cuisine, can never be open to a new culture. Leela Majumder, whom I introduced at the beginning has told us that mixing and matching Indian and foreign foods for the same meal should never be a big deal. It is completely ok to have a main dish of Indian style chicken, and then have a French style dessert. Some of the recipes in this edition are handed down in families, which always make them extra special.



Karubi

Dave Symons

Introducing the food

I was first introduced to Korean barbecued short ribs when I was in Japan. It was introduced to me as *karubi* at the time and it wasn't until a year after I returned to The States that I found it was in fact *kalbi*. In my mind it will always be *karubi* but no matter how you pronounce it. The long marinate time means it is the perfect hamburger alternative for camping trips or even just a late summer backyard party.

Why it works...

The pureed Asian pear is a great alternative to honey as it tenderizes the meat but also gives it a sweeter flavor. The garlic, ginger, and toasted sesame oil is what really gives it that "Asian" flavor while the scallions give it fresh notes.

Ingredients

- 1/4 cup fresh Asian pear juice or puree
- 2 tablespoons toasted sesame oil
- 2-3 cloves garlic, crushed
- 1-2 scallions(spring onions), chopped
- 1 1/2 teaspoons grated fresh ginger
- 1 tablespoon brown sugar
- 1 teaspoon toasted sesame seeds
- Dash of freshly ground black pepper

Directions

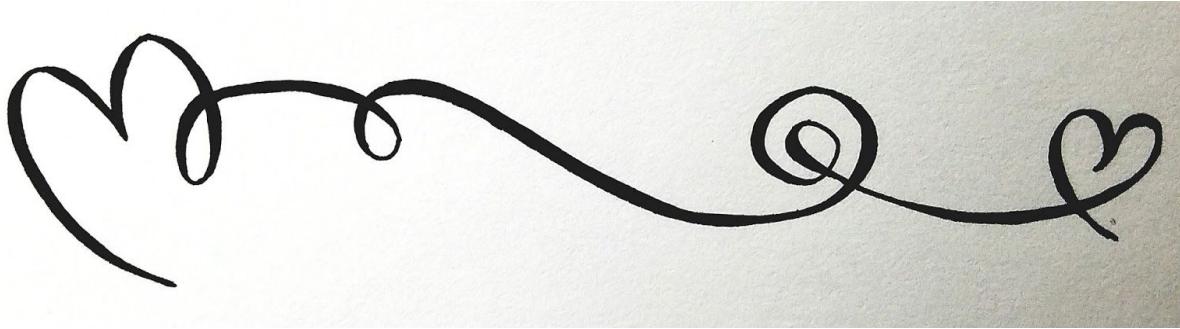
- Combine all ingredients in a small bowl. Taste and adjust quantities, if desired.
- Place the meat in a shallow dish or zip-top bag and coat evenly with marinade.
- Marinate for at least 2 hours and up to a day, turning at least once.
- Barbecue the ribs in your preferred style.

Notes

Makes about 1/2 cup – enough for 6 beef short ribs.

Making 1/4 cup of juice requires about 1/4 to 1/2 of an Asian pear.

Use a juicer or blender or finely grate the pear and squeeze to extract the juice.



Borscht (Борщ)

Andrei Tichenkov

Introducing the food

Borscht is a famous kind of sour soup that is found in Russian, Ukrainian, Romanian, and other Eastern European cuisines. The main ingredient is beetroot, but there are some other kinds of borscht too that use other vegetables.

Ingredients

For 3-4 litres of soup

- Beef (Whole beef with bone with bone marrow) - 700g
- Beets - 2 to 3 medium size beets
- 1/3 Pickled cabbage 2/3 fresh - 3 cups
- Potato - 2 medium size
- Carrots - 1 large
- Yellow Onion - 1 onion
- Tomato paste - 2-3 Tbsp
- A bit of jalapeno
- Salt to taste
- Apple cider vinegar

Directions

- Peel beets, grate it with large size grater. Put into bowl. Mix vineger with equal parts water and pour into bowl with grated beets making sure to cover it all equally. Leave sitting for at least an hour in compressed state.
- Cook beef on slow simmer for an hour, keep stirring in the resulting foam, this increases flavor. While beef is cooking,
- peel and cut potato into large pieces,
- peel carrot and grate in same grater as beet,
- cut onion into fine bits.
- Cut up fresh cabbage

- Pan fry up the soaked beets on medium - high heat until it's soft and ready, try it to make sure it is not crunchy (up to 10 min), add in carrots and onion mid way through. After this is all cooked add in tomato paste and simmer for a couple minutes
 - Place pickled cabbage in simmering beef when the beef is almost ready (just a bit less than an hour usually)
 - 5-10 minutes later add the fresh cabbage and potato.
 - When potato is ready (when no longer crunchy) add in the contents of the frying pan into pot. Add in very finely chopped (about 1/4) of jalapeno without seeds. Let sit for at least an hour for optimal results for ingredients to mix. Add salt to taste
 - Add sour cream if you want to your own portion when you eat it.
-

কারিপাতার আলুর দম

নীতাষ্মৈ

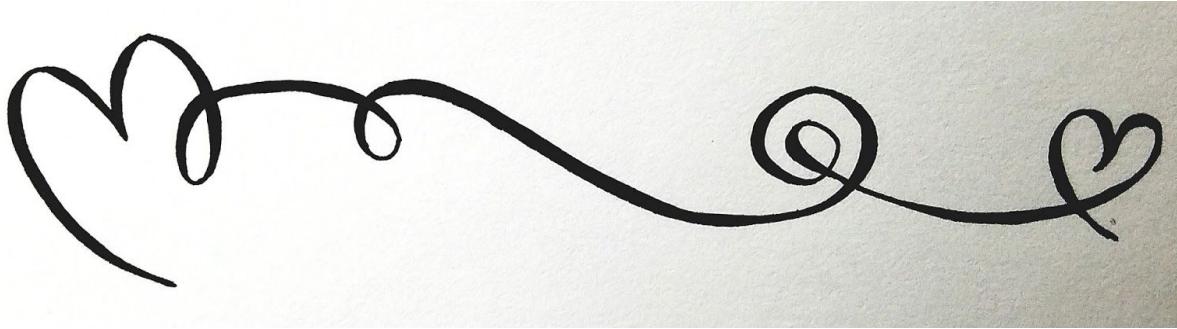
আলুর দম আমদের খুবই প্রিয় খাবার। বানাতে বেশি ঝঞ্চাট নেই, রস্টি, লুচি, পরোটা সবের সঙ্গে খাওয়া যায়। জলখাবারে খাওয়া যায়, আবার দুপুরে বা রাতে খেতেও কোনও অসুবিধে নেই। কারিপাতা দিয়ে আলুর দম একটু নতুন ধরণের ব্যাপার, তাই চেথে দেখাই যাক কেমন লাগে!

উপকরণ

- মাঝারি মাপের আলু ৫ টি,
- নূন,
- হলুদ (গুঁড়ো) সামান্য পরিমাণ,
- আদাবাটা,
- সাদা তেল,
- সাদা সর্বে,
- কাঁচা লঙ্ঘা,
- কারিপাতা।

প্রণালী

- প্রথমে আলু সিদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে রাখুন।
 - তারপর কড়াইতে সাদা তেল দিয়ে গরম করুন।
 - তেল গরম হলে তাতে সাদা সর্বে, কাঁচা লঙ্ঘা, কারিপাতা ফোড়ুন দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করুন। তারপর পরিমাণ মতো আদাবাটা দিয়ে একটু ভাজা ভাজা হলে তাতে টুকরো করে কাটা সিদ্ধ আলু নূন, সামান্য হলুদ গুঁড়ো দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে পরিমাণ মতো জল দিন।
 - ভালো করে ফুটে উঠলে গা-মাখা-মাখা করে নাবিয়ে নিয়ে ফুলকো লুচি কিংবা পরোটার সঙ্গে পরিবেশন করুন। অতিথি নিশ্চয় প্রশংসন করবেন।
-



পেঁয়াজ ইলিশ

প্রণতি ঘোষ

ইলিশ মাছ খেতে ভালোবাসে না এমন বাগালি খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। ইলিশ বললেই মনে হয় ঝমঝমে বৃষ্টি পড়া কোনো দিনে থিচুড়ির সঙ্গে ভাজা মাছ, বা ইলিশের তেল দিয়ে ভাত, আর সর্বে বাটা দিয়ে বাল বা পাতুরি তো দেবভোগ্য ব্যাপার! ইলিশের এই পেঁয়াজ দিয়ে রান্নাটা বেশ নতুন রকমের, তাই এটাও যোগ হল ইলিশের রান্নার তালিকায়।

উপকরণ

- ইলিশ মাছ,
- পেঁয়াজ বাটা,
- রসুন বাটা,
- লঙ্কা গুঁড়ো,
- আদা বাটা,
- দুধ,
- সাদা তেল,
- সর্বে বাটা,
- পোষ্ট বাটা,
- নূন,
- চিনি ,
- টমেটোর রস।

প্রণালী

- দুধের মধ্যে সাদা তেল মিশিয়ে রাখুন।
- ইলিশ মাছের মধ্যে সব বাটা মিলিয়ে নূন ও সামান্য চিনি দিয়ে ওই তেল মেশান দুধ দিয়ে ম্যারিনেট করুন।
- ম্যারিনেট করার সময় টমেটোর রস দিতে হবে। ১ ১/২ ঘন্টা থেকে ২ ঘন্টা পর্যন্ত ম্যারিনেট করতে হবে।
- উন্নুনে তেল গরম হলে সামান্য কাঁচা লঙ্কা দিয়ে সামান্য ভাজুন। ওই ম্যারিনেট করা ইলিশ মাছ দিয়ে রান্না করুন। দরকার হলে ওই তেল মেশান দুধ অল্প একটু মিশিয়ে দিন। বেশ মাঝে মাঝে হলে নামিয়ে নিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন ধোঁয়া ওঠা ভাতের সঙ্গে।



Mary Baroody's \$10 Shortbread Cookies

Eric Savage

Background

This recipe came from my grandmother's very good friend, Mary Baroody. Our family started to make them yearly during Christmas time. These cookies go very fast and we always need to make more. I have very fond memories of my uncle taking the lead one Christmas making batches and batches of these cookies

Cooking time: 50 min

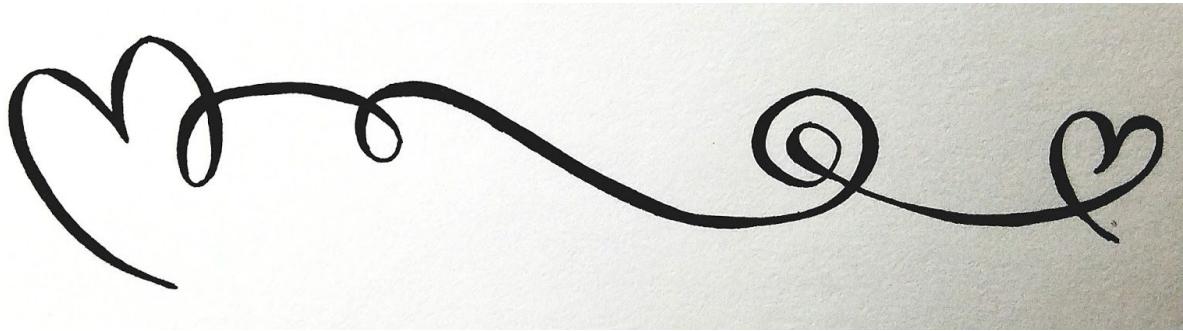
Preheat oven to 300 degrees

Ingredients:

- 1 ¼ cup oats, old fashioned
- 1 ¾ cup flour
- ½ cup powdered sugar
- ½ stick butter
- ½ teaspoon vanilla extract

Directions:

- Cream all ingredients together
 - Roll out into logs
 - Refrigerate or freeze to firm them
 - Slice into ¼" thick pieces
 - Bake
-



Korean 101

Suji Kim

Learn simple Korean phrases that may be helpful at daily encounters of Korean culture.... Or just for fun!

At Restaurants

감사합니다. (Kham-Sa-Ham-ni-da)



Means “Thank you.” May be used in formal situations and/or to strangers.

잘 먹었습니다. (Jal Meok-Eot-Sum-ni-da)

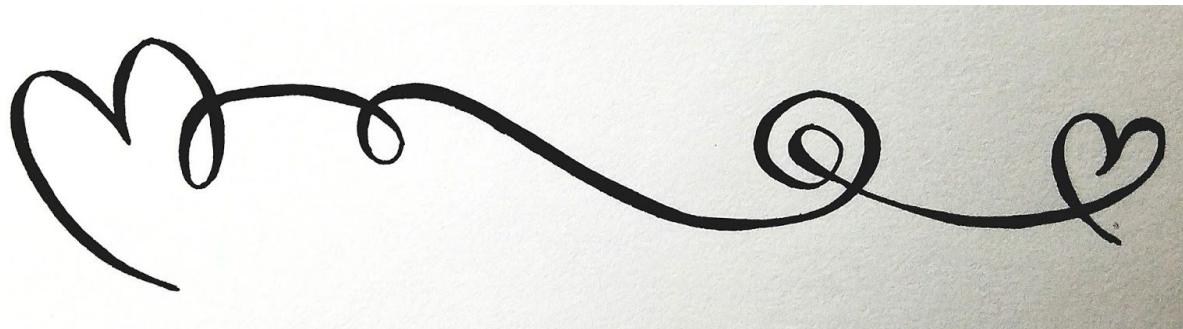
Means “Thank you for great meal, I had it well.” May be used when leaving restaurants or when leaving house party you were invited to.

저기요 (Jeo-Ghi-Yo)

Means “Excuse me.” May be used to refer or call servers. Substitute is 어머님 (O-mo-nim) or 아줌마(A-Jum-ma), each means “mother” in formal situation and “lady” who are in 40s ~50s. Both could be used to refer your friend’s mother. Tip: “Mother” would be more respectful than “lady.”

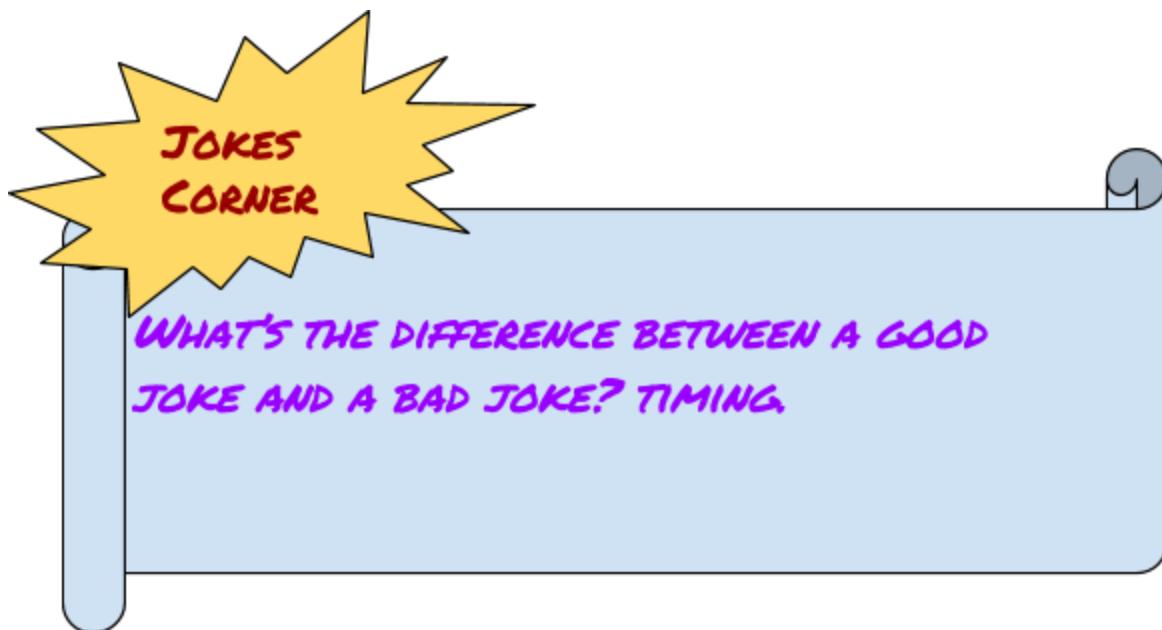
더 주세요 (Deo Ju-Se-Yo)

Means “Please give me more ~.” May be used to get refills on side dishes or any situation that you might want more of something. Removing “Deo” in front, it means “may I get~? Or Please get me ~”



ধাঁধার উত্তর

- ১। লোকটা দিনের বেলা হাঁটছিল।
 - ২। ওই ডিমটা সেদ্ধ করা ছিল।
 - ৩। ওই লোকটা খুনি। জাপানের পতাকার সোজা-উল্টো দুইই সমান।
 - ৪। “মিষ্টি”
-





সকলে মৃৎপ্রদীপের শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন

